ইসলামী রাজনীতি

আনসার আলী

ইসলামী রাজনীতি

আনসার আলী

রেহানা প্রকাশনী

www.bjilibrary.com

ইসলামী রাজনীতি

আনসার আলী

প্রকাশিকা
রেহানা প্রকাশনী
৭৮/১, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

প্রথম মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ ইং

২য় প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং

শব্দ বিন্যাস
আবুল কালাম আজাদ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
ফোন ৯৩৪২২৪৯

মুদ্রণে
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড
বড় বগবাজার, ঢাকা১২১৭।

মূল্য ঃ ১৪.০০ টাকা মাত্র।

www.bjilibrary.com

লেখকের কথা

ইসলামে রাজনীতি আছে কি নাই, থাকলেও তা আবশ্যিক, না ঐচ্ছিক, পবিত্র ইসলামের মধ্যে রাজনীতির মতো পঙ্কিল বিষয় থাকবেই বা কেনো, মসজিদে রাজনীতি চলবে কি চলবে না- এসব বিষয় নিয়ে আজকের মুসলমান সমাজ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। এসব ভ্রান্তি নিরসনকল্পে পূর্বে দু'টি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলাম। বিষয়বস্তুর মিল থাকায় দু'টি পুস্তিকাকে একত্র করে 'ইসলামী রাজনীতি' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিলাম। এ পুস্তিকার দ্বারা সমাজের মানুষের বিভ্রান্তি সমান্যতম দূরীভূত হলেও নিজের শ্রম স্বার্থক বলে মনে করবো।

ইতি

আনসার আলী

www.bjilibrary.com

বিষয়সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইবাদাতের পরিসর	১
কালিমা তাইয়েবা কি বলে	৬
মসজিদে রাজনীতি নিষিদ্ধের আওয়াজ তোলে কারা	৯
সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া	১০
মুসলমানদের করণীয়	১০
আশার কথা	১২
রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা	১৫
ইসলামী ও অনৈসলামী রাজনীতির পার্থক্য	২০
অন্যান্য ধর্মে রাজনীতির নাই কেন?	২৩
ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বিরোধিতা করে কারা	২৪
বিরোধিতার ধরণ	২৬
ইসলাম বিরোধীরা মুসলমানদের যে ক্ষতি করেছে	২৭
অমুসলিমরাও আল্লাহর বিধানে শান্তি পায়	৩০
শেষ কথা	৩১

www.bjilibrary.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার রাসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে ইবাদতের নিয়ম-কানুন বেঁধে দিয়েছেন। এ নিয়ম পরিবর্তনের অধিকার আর কোন মানুষকে দেয়া হয়নি। সুতরাং কোন মানুষ পারে না এ নিয়মের সাথে কিছু যোগ করতে অথবা এ থেকে কিছু বাদ দিতে।

এখন আল্লাহর ইবাদত কাকে বলে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা হওয়া দরকার। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের সূরা আয-যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে বলেছেন ঃ

"আমি জ্বীন ও মানুষকে আমার ইবাদত করা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"

আল্লাহর এ ঘোষণা বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি আর কোন উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেননি কেবলতার ইবাদত করা ছাড়া। আল্লাহর ইবাদত বলতে আমরা বুঝি- নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি। এখন ইবাদত যদি এ কাজগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে মানুষ এর বাইরে আর কোন কাজই করতে পারে না। করলে তা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পরিপন্থি কাজ বলে গণ্য করতে হবে।

কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখি?

এ পৃথিবীতে বসবাসকালীন সময়ে মানুষ জীবন ধারনের জন্য খাদ্য গ্রহণ করে। পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। ঘরবাড়ী তৈরী করে। জীবিকার প্রয়োজনে চাষাবাদ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য চালায় কল-কারখানা গড়ে। শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সরকার প্রতিষ্ঠা করে। বিচার পাওয়ার আশায় আদালতে মামলা-মোকদ্দমা দায়ের করে।

এ পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে এ সকল কার্যাদি বাদ দেয়া সম্ভব নয়

নামায-রোযার মতো আনুষ্ঠানিক ইবাদত তো মানুষ বেঁচে থাকার পরই করতে পারে। আর বেঁচে থাকতে হলে উপরোল্লিখিত কাজগুলো একান্তই অপরিহার্য। এসব অপরিহার্য প্রয়োজনের মধ্যে আল্লাহর ইবাদাতের নিয়ম-কানুন না থাকলে 'মানুষকে কেবল আল্লাহরই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করাহয়েছে' আল্লাহর এ ঘোষণা কার্যকরী হতে পারে না। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রকার দূর্বলতা, অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত বিধায় তাঁর সকল ঘোষণা অবাস্তব, অপূর্ণ, অসঙ্গত হওয়ার ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নির্দেশ দানের সাথেসাথে মানুষের জীবন ধারণের সর্বপ্রকার প্রয়োজন পূরণের উপায় সম্পর্কে নীতিমালা নির্ধারণ করে মানুষের সামগ্রিক জীবনের সকল কর্মকান্ডের মধ্যে ইবাদতের নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবনের সকল প্রকার কার্য্যের মধ্যে আল্লাহর ইবাদত করার নিয়ম দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করি, তাদেরকে কেবল রাসূল (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথেই জীবনের সকল কর্মকান্ড সম্পাদন করে মুসল-মানিত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে। এ পথ থেকে যতটুকু সরে দাঁড়াবো, আল্লাহর ইবাদত থেকে ততটুকু বিমুখ হবো এবং আল্লাহর আনুগত্যের বিধান আল ইসলাম থেকে

www.bjilibrary.com

ততটুকু দূরে সরে যাবো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের জীবন ধারণের জন্য কোন্ কোন্ খাদ্য গ্রহণ করা যাবে আর কোন্ কোন্ খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না এবং আয়-রোজগারের জন্য কোন্ পথ নিষিদ্ধ আর কোন্ পথ খোলা তা যেমনি বলে দিয়েছেন, তেমনি বিচার-আচার কিভাবে হবে, রাষ্ট্র সরকার গঠন করতে হবে কোন্ পথে, সরকারই বা কোন্ নিয়ম-নীতি দ্বারা দেশ শাসন করবে, সেটাও বলে দিয়েছেন। পররাষ্ট্র নীতি, আন্তর্জাতিক নীতি, যুদ্ধনীতি, সন্ধিনীতি সবকিছুই আল্লাহর নির্দেশে রাসূল (সাঃ) মানুষকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। মানুষের সামগ্রিক জীবনের জন্য আল্লাহর দ্বীনের সকল শিক্ষা প্রশিক্ষণ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মসজিদ থেকেই দিয়েছেন। তিনি মসজিদকেই সকল প্রকার জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। আমরা রাসূল (সাঃ)-এর জীবনে দেখতে পাই, তিনি যেমন মদীনার মসজিদে নববীতে নামায কায়েম করেছিলেন, তেমনি এই মসজিদ থেকে সরকারী নির্দেশ দান করেছেন, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি রাজনৈতিকঅবস্থাও আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। সাহাবায়ে কিরামদেরকে যুদ্ধের ব্যাপারেও নির্দেশ দিয়েছেন, বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলেছেন। মসজিদই ছিলো সচিবালয়, বিশ্ববিদ্যালয়। মোট কথা, আল্লাহর সকল নির্দেশ কার্যকরী করার পরামর্শ মসজিদে নববীতে বসেই করা হয়েছে। মানুষের সামগ্রিক জীবন পরিচালনার ব্যাপারেই আল্লাহর নির্দেশ এসেছে বিধায় কোন বিশেষ অংশ সম্পর্কে মসজিদে আলোচনা করা যাবে না এটা হতেই পারে না। তবে শর্ত হবে এই যে, মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশিত পথ ও মতের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। এ পথে চলার, এ পথে টিকে থাকার, এ পথ প্রতিষ্ঠা করার কলাকৌশল সম্পর্কিত আলোচনা-পর্যালোচনা আল্লাহর ইবাদতের মধ্যেই গণ্য হবে। রাসূল (সাঃ) এসব কাজ মসজিদে করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই মানুষের অন্যান্য জীবনের ন্যায় রাজনৈতিক জীবনের ইসলামী সমাধান সম্পর্কে মসজিদে আলোচনা অবশ্যই হতে হবে।

রাজনৈতিক বিষয়ে সমস্যা সৃষ্টি হলে মানব জীবনের সকল ব্যবস্থাই বিকল হয়ে পড়তে পারে, এহেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মসজিদে আলোচনা হতে পারে না এটা কি করে সম্ভব? মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন নিয়ম-নীতি না দিয়ে বিষয়টিকে শয়তানের মর্জির উপর ছেড়ে দেবেন এটা মহাদয়াবন আল্লাহতায়ালা কি করে করতে পারেন?

নিশ্চয়ই তিনি মানুষের প্রতি এ অবিচার করতে পারেন না।

আল্লাহ রাহমানুর রাহীম অবশ্যই মানুষের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিধান দিয়েছেন। আসুন ভেবে দেখি, ইসলামে রাজনীতির বীজ কোথায়।

কালেমা তাইয়্যেবা কি বলে

ইসলামের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করতে হলে মৌখিকভাবে কালেমা তাইয়্যেবার ঘোষণা দিতে হয় এবং অন্তরে তা বিশ্বাস করতে হয়। এই কালেমাকে অমান্য করে বাকী সকল প্রকারের ইবাদতসম্পন্ন করলেও কেউ মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং এ কালেমার শিক্ষা ও তাৎপর্য অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কালেমায় ঘোষণা দেয়া হয় ঃ

> "আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ (রাসূল)।"

আর কোন ইলাহই মানি না আল্লাহ ছাড়া, এই ঘোষণা দিয়ে আমরা কি বুঝাচ্ছি এটা তলিয়ে দেখা দরকার। ইলাহ শব্দটিকে ভালোভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন। এটা

www.bjilibrary.com

একটি আরবী শব্দ। ইলাহ বলতে বুঝানো হয় সার্বভৌম সত্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা, আদেশদাতা ইত্যাদি। ইলাহ শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা বেশী থাকলেও সার্বভৌম স্বত্ত্বাই এর প্রধান অর্থ বলে বিবেচিত হয়। এই অর্থ দ্বারা আল্লাহতায়ালাকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়। যে ক্ষমতার উপরে কারো কোন ক্ষমতা চলে না সেই ক্ষমতাই সার্বভৌম ক্ষমতা বা সার্বভৌমত্ব। ইংরেজীতে একে বলে Sovereignty. কালেমা তাইয়্যেবা পড়ে ইসলামে প্রবেশকারীরা এই ঘোষণাই দিয়ে থাকেন যে, সকলের উপর আল্লাহর কর্তৃত্ব, প্রভুত্বই চলবে, তার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা কারো নেই। আল্লাহর কর্তৃত্ব কোন বিশেষ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বা কোন বিষয়কেবাদ দিয়ে তা প্রয়োগ করা হয় না। এ কর্তৃত্ব সকল বিষয়ের উপর প্রযোজ্য, সকল বিষয়ে আল্লাহর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন ঃ

"আল্লাহ ছাড়া নির্দেশ দানের কারো অধিকার নেই।"

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আনুষ্ঠানিক ইবাদত সম্পর্কিত সকল বিষয়েই আল্লাহর সিদ্ধান্ত মানতে হবে। মহান প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যে কোন আদেশ অস্বীকারকারী নিঃসন্দেহে কাফের। তাই তিনি সূরা মায়েদায় বলেছেন-

"আল্লাহর মতে যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফের।"

এই বিচার-ফায়সালা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে নয়, বরং পৃথিবীতে জীবনযাপনকালে যে কোন বিষয়ের সমস্যাই সৃষ্টি হোক না কেনো, সকল বিষয়েই আল্লাহ রাসূলের মত গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী কাফের হতে হবে।

আল্লাহর এই সর্বব্যাপী কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব মানুষের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সকল আইন-কানুনের বেলায়ও সমানভাবে প্রযোজ্য। মহানবী (সাঃ) রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আল্লাহর আইন বাস্তবে কার্যকরী করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এ আইন প্রয়োগের ফলে সমাজে মানুষ যে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেয়েছিলো। তা আর কোন আইনে সম্ভব হয়েছে বলে পৃথিবীবাসীর কাছে প্রমাণ নেই।

পবিত্র কুরআনে যে সকল বিষয়ে আল্লাহতায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন তা পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে সুবিধা মতো কিছু বাদ দিয়ে কিছু মেনে নেবার অবকাশ নেই।

এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন ঃ

"তোমরা আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অমান্য করবে? নিশ্চয়ই যারা এরূপ করবে তারা পৃথিবীতে হবে লাঞ্ছিত আর আখিরাতে তাদেরকে কঠিন আযাবের দিকে ঠেলে দেয়া হবে।" সুতরাং এখানে

"নামায ও যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করো" এ আয়াতও যেমন মেনে চলতে হবে

"চোর নর হোক নারী হোক তার হাত কেটে দাও।" এ আয়াতও সমান গুরুত্বের সাথেই মেনে চলতে হবে।

সুতরাং, আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারেই এ কথা বলতে পারি যে, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের ব্যাপারে আমাদেরকে যেমন গুরুত্বের সাথে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলতে হবে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেও আল্লাহ সার্বভৌমত্ব মেনে তার আইন-কানুন সমান গুরুত্ব দিয়ে মেনে চলতে হবে। এ আইন সমাজে প্রতিষ্ঠিত না থাকলে তা প্রতিষ্ঠা করে নেয়া মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এ কাজের জন্য জিহাদকারীদের আল্লাহর ভালোবাসেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

"আলাহ তো ভালোবাসেন তাদেরকে যারা আল্লাহর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে।" (আছছফ)

www.bjilibrary.com

অতএব আল্লাহর বিধানের কোন অংশ বাদ রেখে আত্মতৃপ্তি লাভের অবকাশ মুসলমানদের জন্য বাকী নেই। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বা Sovereignty-কে ঘিরে পৃথিবীর মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকান্ড কি তা আসুন ভেবে দেখি।

একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব এই চারটি উপাদানের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। আমরা সার্বভৌমত্বকেই আলোচনার জন্য বেছে নিলাম। সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান। এটা ব্যতীত রাষ্ট্র হতেই পারে না।

সার্বভৌমত্ব বা Sovereignty বলতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা বা Superme Power-কেই বুঝায়। এ ক্ষমতা রাষ্ট্রের ভেতরের ও বাইরের সর্বপ্রকার ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণমুক্ত। কে এই ক্ষমতা ব্যবহার করবে, কিভাবে ব্যবহার করবে, এ ক্ষমতা লাভের পন্থা কি কি এ বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয়। বলা বহুল্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এটি অন্যতম প্রধান বিষয়। পৃথিবীর বিখ্যাত রাজনীতি বিজ্ঞানের চিন্তাবিদগণ অনেক চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করেছেন যে Sovereignty belongs to the people অর্থাৎ জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। আমরা সমাজ জীবনে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীকে লড়ালড়ি করতে দেখি। এসব কর্মকান্ডকেই আমরা রাজনীতি বলি। রাজনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করাই এখন পৃথিবীবাসী মানব সমাজের আইনগত স্বীকৃত পন্থা। অবশ্য বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও হতে দেখা যায়। যা হোক রাজনীতির উদ্দেশ্যই হচ্ছে সরকারী ক্ষমতা লাভ করে আইন-কানুন রচনা ও প্রয়োগের দ্বারা দেশ শাসন করা অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করা। ইসলামী বিধান মতে এ ক্ষমতার নিরঙ্কুশ অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্‌। তিনি তার খলিফা (প্রতিনিধি) মানুষের মাধ্যমে এ ক্ষমতা ব্যবহার করবেন। তিনি মানুষের জন্য আইন-কানুন তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলদের মাধ্যমে পৌছিয়ে থাকেন। নবী-রাসুলগণ নিজেরা এ সকল আইন-কানুন মানব সমাজে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়ে যান। এখন যাঁরা নিজেরেদকে মুসলমান বলে দাবী করেন তাঁদেরকে অবশ্যই মনে নিতে হবে যে উলূহিয়াত বা সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহরই হাতে। এতে আর কোন সৃষ্টির কোনই অংশ নেই। কালেমা তাইয়্যেবার ঘোষণা দিয়েই এ কথার স্বীকৃতি দিতে হয়।

সুতরাং পৃথিবীর সমস্ত চিন্তাবিদগণ যদি একযোগে চিৎকার করে বলতে থাকেন যে, সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে, তবুও কোন মুসলমান এ কথা মেনে নিতে পারবেন না। মুসলমানদেরকে আল্লাহর উলুহিয়াতই মানতে হবে। আল্লাহ ব্যতীত সকল ইলাহ বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকেই অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহকেই এ ক্ষমতার নিরঙ্কুশ মালিক মেনে তাঁরই হুকুম-আহকাম মানার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তিনি যে আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি দিয়েছেন, কেবল সেগুলোই সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবেন।

সুতরাং মুসলমানের রাজনৈতিক কর্মকান্ড গড়ে উঠবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে বা কালেমা তাইয়্যেবাকে বাস্তব রূপ দিতে। কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলমানগণ আল্লাহর নির্দেশাবলী লাভ করে থাকেন, তাই তাদেরকে এগুলো গুরুত্বসহকারে অধ্যয়ন করতে হয়। বাস্তব জীবনে অনুশীলনের জন্য সাধারণ মুসলমান বিজ্ঞ আলেমদের থেকে এসব বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে থাকেন।

বলাবাহুল্য আল্লাহর ঘর মসজিদ কুরআন হাদীস গবেষণার দ্বারা আদেশসমূহ বুঝে নেবার উপযুক্ত স্থান। কুরআনী জীবনযাপনের যাবতীয় প্রশিক্ষণ মসজিদে হতে হবে।

www.bjilibrary.com

এখানকার শিক্ষাই গোটা সমাজে প্রতিফলিত হবে। সুতরাং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার রাজনীতি মসজিদে অবশ্যই চলবে এবং সর্বপ্রকার অধিকার সহই চলবে। কোন মানুষকে এ অধিকার খর্ব করার এখতিয়ার দেয়া হয়নি। যদি কেউ গায়ের জোরে এ অধিকার খর্ব করতে চায়, তবে মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হয়ে পড়ে জিহাদের মাধ্যমে এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখার।

এখানে উল্লেখ্য যে, মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার কুফরী রাজনীতি মসজিদে চলার সামান্যতম অধিকারও স্বীকৃত নয়। কারণ কুফরী ব্যবস্থা উৎখাত করে খোদায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই মুসলমানদের কর্তব্য হিসেবে আল্লাহতায়ালা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লা রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন ঃ

"তিনিই সেই মহান সত্ত্বা যিনি সত্য দ্বীন ও হেদায়েতসহ রাসুল প্রেরণ করেছেন । যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর এ দ্বীনকে বিজয়ী করে দেন, মুশরিকরা তা যতোই অপছন্দ করুক না কেনে।" (আস-সাফ)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ নবী ও রাসূল। পৃথিবীতে আর কোন নবী আসবেন না। নবীদের এ দায়িত্ব পালনের ভার মুসলিম জাতির উপর অর্পিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন-

"আমি তোমাদেরকে এক মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি যাতে করে তোমরা লোকদের জন্য স্বাক্ষী হও আর রাসূলও যেনো তোমাদের জন্য সাক্ষী হন।"

আল্লাহর দ্বীন বা আনুগত্যের বিধান সকল বিধানের উপর বিজয়ী করার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর ন্যস্ত হয়েছে বিধায় কেবল এ আদর্শের চর্চাই মসজিদে হবে। অন্য কোন রাজনীতির ঠাঁই মসজিদে নেই।

মসজিদে রাজনীতি নিষিদ্ধের আওয়াজ তোলে কারা?

মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যারা রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালিয়ে যায়, এমন কিছু দলের নেতা ও কর্মীদের মাঝে মধ্যে মসজিদে রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জিগির তুলতে শোনা যায়। এদের অধিকাংশই বস্তুবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। তারা কেউ আল্লাহর অস্তিত্বই স্বীকার করে না, আবার কেউ স্বীকার করলেও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে মানুষের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে। এদের সকলেই মানব রচিত আইন-কানুন সমাজে চালু করতে চায়। ধর্মকে এরা জঞ্জাল মনে করে। নৈতিকতার আদৌ কোন ধার ধারে না। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধোকাবাজি, প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্ষমতা হাতে পেলে ক্ষমতার পুরো অপব্যবহার করে। এদের ব্যক্তি জীবন যেমন অসাধু কর্মকান্ডে ভরপুর, তেমনি রাজনৈতিক জীবনও ধোকাবাজীপূর্ণ। রাজনীতি বলতে এরা নিজেরাও ধোকাবাজী নীতি বোঝে অন্যদেরকে তাই বুঝায়।

রাজনীতির পুরো কর্মকান্ডকেই ধোকা, প্রতারণা ও জালিয়াতির বিষয় হিসেবে এরা জমসমক্ষে উপস্থিত করে। তারা তাদের রাজনীতির এই উদ্ভট চেহারা ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের মনেও চিত্রিত করতে সমর্থ হয়েছে। এরা ঝোপ বুঝে কোপ মারতে উস্তাদ। ধর্মের প্রতি নকল দরদী সেজে বলে, রাজনীতির মতো নিকৃষ্ট বিষয় মসজিদে চলতে দিলে মসজিদের পবিত্রতাই নষ্ট হয়ে যায়। একথা শুধু নিজেরা বলেই ক্ষান্ত হয় না। কথাটাকে একটু বিশ্বাস নির্ভর করতে আলেম নামধারী কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদেরও কাজে লাগায়।

www.bjilibrary.com

সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া

ঈমানদার মুসলমানগণ আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা পোষণ করেই ধর্ম পালন করে থাকেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন না বলে মতলববাজ রাজনীতিবিদদের ধোকার শিকার হয়ে পড়েন। তারা কালেমা বিরোধীদের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারের অন্তর্নিহিত ষড়যন্ত্র বুঝতে না পেরে অনেক সময় এই খলদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে বসেন। ফলে ইসলাম বিরোধীরা মুসলমানদে মধ্যে দল-উপদল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। খোদাভীরু মুসলমানরা এই কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে নিজেদের মধ্যে ফেরকাবাজী ও উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি করে।

নাস্তিক খোদাদ্রোহী মতলববাজরা ঈমানদার মুসলমানদের শতধা বিভক্ত কিছু অংশকে নিজেদের স্বার্থে অন্য অংশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তারা এভাবে ইসলামের দুশমনদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ বিরোধী শক্তির মোকাবিলায় দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই মুসলিম প্রধান দেশেও বামপন্থী নাস্তিক আধা-নাস্তিকরা মসজিদে কালেমা তাইয়্যেবার রাজনীতি নিষিদ্ধ করার আব্দার জানানোর স্পর্ধা দেখায়।

মুসলমানদের করণীয়

আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

"তিনিই সেই মহান সত্ত্বা যিনি সত্য দ্বীন ও হেদায়েত সহকারে রাসুল প্রেরণ করেছেন। যেনো রাসূল সকল দ্বীনের উপর এ দ্বীনকে বিজয়ী করে দেয় তা মুশরেকরা যতোই অপছন্দ করুক না কেন!"

এখন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মুসলমানদের মধ্যে বর্তমান নেই এবং ভবিষ্যতেও আসবেন না। সে জন্য আল্লাহর দ্বীন বা আনুগত্যের বিধান মানব রচিত সকল বিধানের উপর বিজয়ী করে দেবার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর অর্পিত হয়েছে। এ দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। সুতরাং কালেমা তাইয়্যেবা আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠার রাজনীতি যারা মসজিদ থেকে মুছে দিতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে অন্যায় আবদার মিটিয়ে দেয়া মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর যমীনকে বাতিলের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর কর্তৃত্বের অধীনে ফিরিয়ে আনার জন্য মুসলমানদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। এ উদ্দেশ্য সাধনে বিক্ষিপ্তভাবে নয়, একতাবদ্ধ হয়ে কাজ চালাতে হবে। আলাহপাক বলেন ঃ

"আল্লাহর রজ্জুকে দলবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

দলবদ্ধ কিভাবে হতে হবে তা রাসূলে করীম (সাঃ)-এর একটি বাণী থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়।

তিনি বলেন, "আমি পাঁচটি বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছি এবং তোমাদেরকে সেই পাঁচটি বিষয়ে আদেশ দিচ্ছি- জামায়াত গঠন করো, নেতার নির্দেশ শুনো, নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলো, হিজরত করো, জিহাদ করো তোমাদের জান ও মাল দ্বারা। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলো সে যেনো ইসলামের রজ্জুকে তার গলা থেকে খুলে ফেললো।" এ হাদীস থেকে দলবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ জানা যায়।

www.bjilibrary.com

জামায়াত বদ্ধ হওয়ার যে নিয়ম এখানে বর্ণিত হয়েছে তা এক এক করে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি।

প্রথমেই আমরা নেতৃত্বের বিষয়টি আলোচনা করি। নেতা ব্যতীত দল বা জামায়াত হতে পারে না। তাই হাদীসটিতে নেতার নির্দেশ শুনতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ নেতার আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। আনুগত্যবিহীন নেতার কথা চিন্তাই করা যায় না। তাই ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) সঠিকভাবেই বলেছেন ঃ

"জামায়াত ব্যতীত ইসলামের অস্তিত্ব নেই, ইমারাত ব্যতীত জামায়াতের অস্তিত্ব নেই, আনুগত্য ব্যতীত ইমারাতেরও অস্তিত্ব নেই।"

এখন একথা প্রমাণিত সত্য যে, জামায়াত বা দল গঠন করতে হবে। এ দলে থাকতে হবে একজন আনুগত্য লাভকারী নেতা বা আমীর। দলের নিয়ম-কানুন মানতে হবে।

হিজরাত করতে হবে। অর্থাৎ নিজের জীবন থেকে ইসলাম বিরোধী সকল কাজকর্ম ও অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। প্রয়োজনে দেশ ত্যাগ করতেও হতে পারে। এ জামায়াতের লোকদের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর দ্বীনি ব্যবস্থা যমীনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করা। এ সকল বৈশিষ্ট্যমন্ডিত জামায়াতে যোগদান না করে, এরূপ একটি জামায়াত গঠনের উদ্যোগ না নিয়ে কোন কল্যাণ লাভ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। রাসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, এমন জামায়াত থেকে কেউ যদি এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে যায়, তবে সে ইসলামের রজ্জু গলা থেকে খুলে ফেলবে। ইসলামের রজ্জু গলা থেকে খুলে ফেলার অর্থ ইসলাম ত্যাগ করারই শামিল।

ইসলাম ত্যাগ করলে আর মুসলমান থাকা যায় কিভাবে? আর মুসলমান না হলে তার নামায রোযাই বা কোন্ কাজে আসবে? সুতরাং আল্লাহর উলুহিয়াত বা সার্বভৌমত্ব যমীনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উল্লেখিত হাদীসটিতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জামায়াতে যোগদান করে বা অনুরূপ জামায়াত গঠন করে কাজ চালিয়ে যাওয়া ব্যতীত পরকালীন মুক্তির পথ কারো জন্যই খোলা নেই। এ কথা জেনে বুঝে সকল ঈমানদার মুসলমানদের দুনিয়ার জীবনের কর্মসূচী ঠিক করে নিতে হবে। অন্যথায় পরকালীন জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে।

মানুষের উলুহিয়াত বা কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে জানবাজ হয়ে রাজনৈতিক কর্মকান্ড চালাতে দেখা যায়। দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করা ছাড়া তাদের আর কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নেই। এ লক্ষ্য হাসিল করতে তারা এতোটা ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হলে আল্লাহর উলুহিয়াত বা সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে জানবাজ কর্মীদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার প্রয়োজন হবে না কেন?

আল্লাহর কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম না করলে কালেমা তাইয়্যেবাকে প্রকৃতপক্ষে অস্বীকারই করতে হয়। এ কালেমাকে অস্বীকার করে মুসলমান থাকা যায় না। মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করলে পরকালে মুক্তিও পাওয়া যাবে না। এ কালেমা যমীনে প্রতিষ্ঠা করা মুসরমানদের অবশ্য করণীয় কাজ। এ কাজ সমাধা করলে শুধু আখেরাতের অনন্তকালীন জীবনের কল্যাণ লাভই হয় না, দুনিয়ার জীবনেও মানুষের সকল প্রকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা অর্জিত হয় এবং মানুষ ভোগ করতে পারে অনাবিল শান্তি।

www.bjilibrary.com

কাজেই মসজিদভিত্তিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী সমাজ গড়ার মধ্যেই মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ কল্যাণ অর্জনের লক্ষ্যে আজকের মানুষের স্লোগান হতে হবে, মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করো। আল্লাহর আইন চাই, সৎ লোকের শাসন চাই।

আশার কথা

সারাবিশ্বের ইসলামবিরোধী শক্তি মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অতীতের ন্যায় বর্তমান কালেও পুরোমাত্রায় তৎপর রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিতে বর্তমান বিশ্ব অনেক ছোট হয়ে এসেছে। তাই অতীতের তুলনায় বর্তমানে ইসলামীবিরোধী পরাশক্তিগুলো পৃথিবীবাসীকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসেই সক্ষম হচ্ছে। খোদাবিরোধী এই অপশক্তিগুলো তাদের মগজ ও সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে।

তারা তাদের লালিত মুসলিম নামধারী প্রতিনিধিদের দ্বারা অনেক দেশের মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে রাজনীতিকে ইসলাম থেকে পৃথক বিষয় হিসেবে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছে। তাদের মদদে মুসলমান নামধারী নাস্তিক ও আধা-নাস্তিক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সংখ্যায় অতি নগন্য হয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে ইস-লামের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে গলাবাজী করতে পারছে। তারা ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের হুমকি-ধামকি দেয়া থেকে শুরু করে খুন-গুম করার মতো ঘটনাও ঘটাতে পারছে। শুধু তাই নয়, দেশবাসীর ভোটে নির্বাচিত ইসলামী দলকে ক্ষমতা লাভ থেকে বঞ্চিত করে তাদের পছন্দ মতো ইসলাম বিদ্বেষীদের ক্ষমতায় বসাচ্ছে। সেই সাথে নির্বাচনে বিজয়ীদের প্রাণদন্ড দেবার মতো জঘন্য অপরাধও করে চলেছে। আল্লাহর দুশমন এইসব শক্তির মদদে বিশ্বব্যাপী ইসলামপন্থীদের উপর চলছে অমানুষিক নির্যাতন। তারা সড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছে সারা পৃথিবীতে। সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ অগাধ সম্পদের অধিকারী এই ঘৃণ্য অপশক্তির মোকাবিলা করা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ, তবে অসাধ্য নয়।

মহানবী (সাঃ)-এর জীবনকাল অধ্যয়ন করলে দেখতে পাওয়া যাবে, বর্তমান কাল থেকেও অনেক বেশী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যদিয়ে তিনি সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। গোটা আরববাসীর চরম বৈরিতার মধ্যেও তিনি ধৈর্যহারা হননি। বিরোধীরা তাকে নানাভাবে পিষে মারতে চেয়েছে। তবুও তিনি দমে যাননি। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন এবং মহান আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেছেন। তিনি সমর্থ হয়েছিলেন গোটা আরব ভূমির উপর ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে। এখানেই শেষ নয়। তার সঙ্গী-সাথীদের দ্বারা তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তি রোম ও পারস্য পদানত হয়েছিলো। ক্রমে মুসলমানরা গোটা বিশ্বের নিকট শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শক্তি-সামর্থে অপ্রদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হতে পেরেছিলেন।

বর্তমানকালে পরাশক্তিগুলো যতোই প্রতাপ দেখাক না কেনো, প্রাণোৎসর্গী ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দ্বীন বিজয়ের দায়িত্ব পালন করে গেলে একদিন পারস্য ও রোমের ন্যায় বর্তমান পরাশক্তিও ইসলামী শক্তির অধীনস্থ হয়ে পড়বে।

www.bjilibrary.com

ইসলামের দুশমনরা ইসলামী আন্দোলনকারীদের মধ্যে যতোই বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করুক না কেনো, আন্দোলনকারীদের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে একদিন তা চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এ জন্য প্রয়োজন শুধু নিবেদিত প্রান একনিষ্ঠ কর্মী বাহিনী, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা ছাড়া আর কোন লক্ষ্যে কাজ করে না। আশার কথা যে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কিছু না কিছু জাগরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা নির্যাতিত হলেও আলজেরিয়ার জনগণ যে ইসলামের অনুবর্তী হয়ে পড়েছে, তা সে দেশের বিগত নির্বাচনের ফলাফলেই বুঝা গেছে। ইরান তো বেশকিছু দিন আগেই বাতিল আদর্শকে সমূলে উৎখাত করতে সমর্থ হয়েছে। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে আফগান মুজাহিদরা প্রাণান্তকর সংগ্রাম চালিয়ে বহু শহীদের রক্তের বিনিময়ে তাদের দেশে ইসলামকে বিজয়ী করতে সক্ষম হয়েছে। তুরস্ক, মিসর, সুদান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান বাধার সম্মুখীন হয়েও আন্দোলন এগিয়ে চলেছে। কম্যুনিষ্ট রাশিয়া ভেঙ্গে যে ৬টি মুসলিম দেশের জন্ম হয়েছে, সেখানে ইসলামের দাওযাত পেশ করার মতো সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশেই আন্দোলনের কাজ কোন না কোন পর্যায়ে এগিয়ে চলেছে। অমুসলিম দেশেও ইসলামকে জানা-বুঝার উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সর্বত্রই ইসলামী আন্দোলন গড়ে না উঠলেও মোটামুটি একটা জাগরণ যে সৃষ্টি হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই পৃথিবীব্যাপী এই জাগরণকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার দায়িত্ব পড়েছে এখন ইসলামী আন্দোলনকারীদের উপর।

পারস্পরিক যোগাযোগ, পরামর্শ ও সহযোগিতার দ্বারা আন্দোলনকারীরা বিশ্বের বুকে এক অপরাজেয় শক্তি হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। বিশ্বের একশ' কোটি মুসলমানদের মধ্যে যদি ইসলামের সঠিক ধারণা দেয়া যায়, তবে তারা বাতিল আদর্শের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তৎপর হয়ে উঠবে। মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এক মানব সমাজে কঠোর বিরোধিতার মধ্যেও ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্টিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এখন বিশ্বে ইসলাম একটি পরিচিত আদর্শ এবং একশ' কোটি মুসলমান এ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সঠিক নেতৃত্বের দ্বারা মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ ও আদর্শের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে পৃথিবীর কোন মানব গোষ্ঠীই এদেরকে দাবিয়ে রাখার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না।

ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রতিনিধিদের আওড়ানো মিথ্যাচারিতার সঠিক জওয়াব জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারলে তাদের পায়ের নীচের মাটি সরে যাবে। তারা অমুসলিম জনগণকে তাদের অনুকূলে ব্যবহার করতে পারবে না।অমুসলিম জনতাকে যে ধোকার দ্বারা তারা ইসলামী সমাজ সম্পর্কে ভয় দেখায়, সে সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করছি। মতলববাজ ইসলাম বিদ্বেষীরা অমুসলিম জনগণকে এই বলে ধোকা দেয় যে, ইসলামী সমাজ ও আইন-কানুন প্রতিষ্টিত হলে অমুসলিমরা আর দেশে থাকতে পারবে না। তাদেরকে দেশ ত্যাগ করতে হবে। সরলপ্রাণ অমুসরিম নাগরিকগণ এই ধোকায় পড়ে তাদের কুমতলবের শিকার হয়ে পড়েন। মতলববাজরা এইভাবে জনতার এক উল্লেখযোগ্য অংশকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। এদের ভুল ভেঙ্গে দেয়া একান্তই প্রয়োজন।

অমুসলিমদের বুঝাতে হবে ইসলাম কখনো তাদের ধর্ম পালনে হস্তক্ষেপ করে না। এ সমাজের অধীনে তারা পূর্ণ অধিকার সহই নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারেন। ইস-

www.bjilibrary.com

লাম সকল মানুষের মতো তাদের উপরও যে নিয়ন-নীতি প্রয়োগ করে তা হচ্ছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। তাদের ধর্মীয় মতের বাইরে এ দুটি বিধান তাদের উপর প্রযোগ করা হয় এ কারণেই হয়তো তারা ভেবে থাকেন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা হলে তাদের উপর ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান চাপিয়ে দেয়া হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত নেই সেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে তারা কোন্ আদর্শ অনুসরণ করে থাকেন? নিশ্চয়ই তারা তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় আদর্শ এ দুটি বিষয়ে অনুসরণ করেন না। তাদের ধর্মীয় বিধানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের নীতিমালা এখন আর অবশিষ্ট নেই বলে বাধ্য হয়েই তাদেকে এ দুটি ব্যাপারে ভিন্ন আদর্শের অনুবর্তী হয়ে চলতে হয়।

এখন ইসলামী সমাজের অনুপস্থিতিতে তারা মানব রচিত রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক নীতিমালা মেনে চলেন। এটি তাদের ধর্মবহির্ভূত নীতি হওয়া সত্ত্বেও যদি তারা মেনে চলতে পারেন, তবে ইসলামী আদর্শের এ দু'টি নীতি মেনে চলতে তাদের আপত্তি থাকবে কেন? মানুষের তৈরী নীতিমালার চেয়ে এ নীতিমালা অনেক উন্নত এবং অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে পূর্ণ নিরাপত্তা বিধানকারী। মানব রচিত আইনে অমুসলিমদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন নীতিমালা থাকেনা বিধায় ধর্মনিরপেক্ষ দেশে অহরহই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের প্রানহানি ঘটে। আল্লাহর আইনে বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে নিয়ম-নীতি বেধে দেয়া হয়েছে বলে ইসলামী সমাজে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আদৌ সম্ভব নয়।

সুতরাং অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রকৃত সত্য অনুধাবন করতে পারলে অমুসলিম নাগরিকগণ নিজদের প্রয়োজনেই ইসলামী সমাজকে স্বাগত জানাবেন। আর একবার এ সমাজে বসবাসের সুযোগ হলে আর কোন দিন তাঁরা ধোকায় পড়বেন না।

এখন ইসলামী সমাজ, ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করতে হলে মসজিদের রাজনীতি অপরিহার্য। এ রাজনীতির বিরোধিতাকারীরা সকল মানুষের সাথে নিজেদের ক্ষতিতেও নিমজ্জিত আছেন। এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে তারা যদি ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দর্শন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণে আন্তরিকভাবে তৎপর হন তবে একদিন তাদের ভুলও ভেঙ্গে যাবে। তারা পেয়ে যাবেন মানব জীবনের সঠিক পথের সন্ধান, যে পথ তাদের দুনিয়ার জীবনে দেবে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এবং আখেরাতের জীবনে অফুরন্ত নিয়ামতে পূর্ণ জান্নাত। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল মানুষকে তার শ্রেষ্ঠ নিয়ামত ইসলামকে জেনে বুঝে পালন করার তৌফিক দিন এবং ইসলামের পীঠস্থান মসজিদের সঠিক ভূমিকা সম্পর্কে সজাগ করুন।

www.bjilibrary.com

রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা

নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, পালনকর্তা ও নিয়ন্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষ সৃষ্টির পূর্বে ফেরেস্তাদের ডেকে বলেছিলেন, "আমি পৃথিবীতে এক খলীফা নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক।" (সূরা বাকারা ঃ আয়াত ৩০)। পরবর্তীতে হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করে কিছু দিনের জন্য বেহেস্তে রাখার পর পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। পৃথিবীতে পাঠানোর সময় তাদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, পৃথিবীতে জীবনযাপনকালে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব আদেশ-নিষেধ যাবে তা পুরোপুরি মেনে চলতে হবে অর্থাৎ আল্লাহর কোন আদেশ-নিষেধ লংঘন করা যাবে না। দুনিয়ার কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে আল্লাহর বেধে দেয়া আইন-কানুন সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিলো।

আনুষ্ঠানিক ইবাদত যেমন নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিয়মাবলী আল্লাহর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো, তেমনি সামাজিকভাবে বসবাস করতে যেসব বিষয়াদি আসে যেমন অর্থনৈতিক কায়কারবার, রাজনৈতিক নিয়ম-কানুন, বিচার সম্পর্কিত নীতিমালা, বিবাহ, তালাক, খাদ্যবস্তু সম্পর্কিত বাচবিচার ইত্যাকার সকল প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা মানুষের জন্য নীতিমালা প্রদান করেছেন।

হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবী-রাসূল (আঃ) কেই আল্লাহতায়ালা সমকালীন সময়ের উপযোগী জীবনবিধানসহ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর প্রেরিত কোন নবী-রাসূলই সমকালীন সময়ের শাসকদের মনগড়া খোদাবিরোধী আইনের অধীনে নিরীহ প্রজা হিসেবে বসবাস করতে রাজি হননি, বরং সকলেই ঐসব বাতিলপন্থী শাসকদের আল্লাহর উলুহিয়াত (সার্বভৌমত্ব) স্বীকার করে আল্লাহর দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) মেনে নেবার আহ্বান জানিয়েছেন। ঐসব শাসকগোষ্ঠীর অধিকাংশই আল্লাহর দ্বীন সহজে গ্রহণ করেনি, বরং তারা দাওয়াত দানকারী নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

আমরা কুরআন-হাদীস পড়ে জানতে পারি যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে তৎকালীন ইরাকের বাতিলপন্থী শাসক নমরুদ অনেক নির্যাতন করে শেষে আগুনে নিক্ষেপ করে। মিশরের ফিরাউন মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে একপর্যায়ে ইসরাইলদের তাড়া করে নদীর কূল পর্যন্ত নিয়ে যায়। এভাবে আলাহর অনেক পয়গম্বরকে ঐসব খোদাদ্রোহী শাকগোষ্ঠী নানাভাবে নির্যাতন করে, কাউকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে, কাউকে করাত দিয়ে ফাড়ে, কাউকে শূলে চড়ায়।

আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন ইতিহাস আজো মানব জাতির সামনে জ্বলজ্বল করছে। তৎকালীন সমাজপতিরা আল্লাহর প্রেরিত এই মহান পয়গম্বার (সাঃ)-এর সাথে কি আচরণ করেছিলো, তা মনে হয় সবিস্তারে আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। আমরা আবু লাহাব, আবু জেহেলের হিংস্রতা, তায়েফের সরদারদের নির্মম আচরণ, নবী (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কিসরা কাইসারদের

www.bjilibrary.com

পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত আছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঐসব খোদাদ্রোহী শাসকরা আল্লাহর প্রেরিত পুরুষদের সাথে কেন এমন নির্মম আচরণ করতো?

আল্লাহর প্রেরিত পুরুষরা কি তাদের সম্পদের ভাগী হতে চাইতেন? নাকি তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগে বাধ সাধতেন?

অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে এ সবকিছুই তাঁরা করতেন না। আসল ব্যাপার অন্যখানে। ঐসব বাতিলপন্থী শাসকরা মানুষকে শাসন করার ব্যাপারে নিজেদেরকে সকল ক্ষমতার মালিক মোক্তার মনে করতো এবং নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন-কানুন রচনা করে মানুষের উপর চাপিয়ে দিতো। তারা তাদের কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) হাত ছাড়া হতে দিতে আদৌ রাজী ছিলো না। সুবিধা ভোগী মানসিকতার কারণে যেসব আইন-কানুন তারা চালু করতো তাতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, মানুষ হতো বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত।

এসব শাসকদের কাছে আল্লাহর নবী-রাসূলগণ যখন আল্লাহর কর্তৃত্ব (উলুহিয়াত) মেনে নেবার দাওযাত পৌছাতেন, তখন রাষ্ট্রক্ষমতা হারানোর স্পষ্ট ইঙ্গিত তারা বুঝতে পারতো। এ কারণে তারা নবী-রাসূলগণের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগতো এবং তাদের মিশনকে স্তব্ধ করে দিতে সম্ভব সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণকরতো।

সুধী পাঠক, এভাবেই আল্লাহর প্রেরিত পুরুষগণ আল্লাহর যমীনে আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রভূত্ব (উলুহিয়াত) প্রতিষ্ঠার কাজে প্রবল বাধার সম্মুখীন হতেন। এতদসত্ত্বেও সর্বশক্তি নিয়োগ করে সম্ভব সকল প্রকার বৈধ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আলাহর মদদে তাঁদের কেউ কেউ সমকালীন সমাজে হুকুমাতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সোলায়মান (আঃ) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। অপরদিকে, আল্লাহর অনেক পয়গাম্বর ক্ষমতা লাভের প্রস্তুতি পর্বেই ইহধাম ত্যাগ করেছেন। বর্তমান পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর নিকট হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ইতিহাস এখন ও পরিচ্ছন্ন অবস্থায় বিদ্যমান। নব্যুয়ত প্রাপ্তির পর থেকেই তিনি কালেমা তাইয়্যেবা অর্থাৎ আল্লাহর কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব মেনে নেবার জন্য মানুষের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকেন। মানুষের কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করে আল্লাহর কর্তৃত্ব মেনে নেবার অর্থই হচ্ছে মানুষের নির্দেশের পরিবর্তে আল্লাহর নির্দেশের কাছে মাথানত করা।

আলাহ যেহেতু জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নির্দেশ দিয়েছেন, তাই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিচার সংক্রান্ত নির্দেশ ও এসবের মধ্যে সামিল রয়েছে এবং এসব কিছুই মানব কল্যাণের স্বার্থেই দেয়া হয়েছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারাই সর্বাধিক মানব কল্যাণ সাধিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ না থাকলে মারামারি কাটাকাটি হানাহানি দ্বারা মানুষের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেতো। বলতে গেলে এ ক্ষমতাই মানব সমাজকে পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখার শক্তি যুগিয়ে আসছে। এ ক্ষমতার তত্ত্বাবধানেই আবিষ্কার উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনের দ্বারা মানব সভ্যতা ক্রমাগত উন্নতির উচ্চতর শিখরে পদার্পণ করে আসছে।

ইসলামী আদর্শ অনুসারে যেহেতু আল্লাহই কর্তৃত্ব প্রভূত্বের একচ্ছত্র মালিক, তাই মানুষের জন্য আইন বিধান রচনার অধিকার একমাত্র তারই অন্য কারো এতে বিন্দুমাত্র

www.bjilibrary.com

অংশ নেই। যখন আল্লাহর নবী-রাসূলগণ কালেমা তাইয়্যেবার ঘোষণা দেয়া শুরু করেছেন, তখনই সমকালীন সময়ের মানুষ বুঝে নিয়েছে এই ঘোষণা দ্বারা আল্লাহর আইন মান্য করার জন্য আহবান জানানো হচ্ছে। আল্লাহর সকল নবী-রাসূলগণের ন্যায় শেষ নবী হযরত মুহামম (সাঃ) ও এই কালেমার ঘোষণাকে কবুল করে নেবার জন্য তৎকালীন আরবের মানুষদের প্রতি আহবান জানাতেন, অর্থাৎ তিনি তাগুতের শাসন অমান্য করে আল্লাহর শাসন মেনে নেবার জন্য দাওয়াত দিতেন। এ দাওযাত কবুলকারীদের সংঘবদ্ধ করে আল্লাহর বিধান মেনে চলা ও এ বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার যোগ্য করে তাদেরকে গড়ে তুলতেন। এ জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও দিতেন। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি কালেমার দাওযাত দেবার শুরু থেকেই আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার রাজনীতি শুরু করেছিলেন এবং এই রাজনীতির বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামগণকে (রাঃ) দলবদ্ধভাবে গড়ে তুলেছিলেন। ইতিহাস সাক্ষী তিনি নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। কখনই তিনি অন্য কোন বাতিল শাসকের অধীনে থেকে নিরীহ প্রজা হিসেবে বসবাস করতে রাজী হননি। তিনি মানুষের কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে পারেননি বলে নিজ জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। মদিনার উপর বাতিলের কর্তৃত্ব রোধে তিনি বদর, ওহুদ, খন্দক যুদ্ধের মত রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে জানমাল বাজী রেখে লড়েছিলেন। মদিনাকে পদানত করার কুরাইশ কাফের ও ইহুদীদের সকল প্রকার চক্রান্তকে কৌশল ও তরবারীর দ্বারা ভন্ডুল করে দিয়েছিলেন।

প্রিয় পাঠক, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের কলাকৌশলকেই তো রাজনীতি বলে এবং এ কাজ মহানবী (সাঃ) নব্যুয়তী জিন্দেগী ভর চালিয়ে গেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আলাহর প্রেরিত মহান পয়গম্বরগণ (আঃ) কেনো রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতেন? শুধু নামায-রোযার ন্যায় আনুষ্ঠানিক ইবাদত পালনের নিয়ম-কানুনগুলো দেখিয়ে দিলেই কি তাদের দায়িত্ব পালিত হতে পারতো না? সংক্ষেপে এ প্রশ্নের জওয়াব এভাবে হতে পারে যে, মহান রাব্বুল আলামীন তার প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে ভালোবাসেন এবং মানুষের কল্যাণ চান।

রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের দ্বারাই মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হয় বলেই তিনি পয়গম্বর (আঃ) এবং তার অনুসারীদের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে চান। সে জন্যই তিনি তাঁর প্রেরিত পুরষদের দিয়ে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়েছেন। আনুষ্ঠানিক ইবাদত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা সৃষ্টি হয় বলে প্রতিটি মুসলমানদের জন্য এ কাজ আলাহর পক্ষ থেকে অবশ্য পালনীয় করে দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজ সহজে এবং দ্রুতগতিতে সম্ভব হয়।

প্রিয় পাঠকের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কায় আল্লাহর দ্বীন প্রচারের কাজ তেরোটি বছর ধরে চালিয়েছিলেন। এ সময় তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করতে পারেননি বলেই নগণ্যসংখ্যক লোককে ইসলামের মধ্যে দাখিল করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। অপরদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে মদীনার জিন্দেগীতে মাত্র দশ বছরে বারো লক্ষ বর্গমাইল ভূখণ্ডের উপর ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে পেরেছিলেন।

www.bjilibrary.com

মানব সমাজে শান্তি স্থাপন ও তা প্রতিষ্ঠিত রাখতে আইন-কানুনের প্রয়োগ অপরিহার্য। আমরা লক্ষ্য করি যে, এক শ্রেণীর মানুষ চুরি, ডাকাতি, খুন-খারাবীর দ্বারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে। তাদেরকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংশোধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে কঠোর শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এখন এসব শাস্তি রাষ্ট্র ক্ষমতা অধিকার করা ছাড়া কারো পক্ষে কার্যকরী করা আদৌ সম্ভব নয়।

মনে করুন, একটি সমাজের সকল মানুষের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আছে এবং সেই সমাজের অধিবাসীরা মুসলমান কিন্তু শাসক অনৈসলামিক আইন চালু করে রেখেছে। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে চোর, ঘুষখোরদের হাত কেটে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলমান হিসেবে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর সকল নির্দেশ মান্য করে চলা অবশ্য কর্তব্য। এখন এই সমাজে যদি চোর, ঘুষখোর ধরা পড়ে, তবে কি মুসলমান নাগরিকরা তাদের হাত কেটে দিতে পারবে? কখনই নয়। যদি কেউ আবেগের বশবর্তী হয়ে চোরের হাত কেটেই বসে, তবে তার দশাটা কি হবে? বাতিল সরকারের পুলিশ তাকে ধরে জেলে পুরবে। বিচারে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। এমনকি তাকে মৃত্যুদন্ডও দেয়া হতে পারে। এভাবে জ্বেনাকারীর বেত্রদন্ড কিংবা সংগেসার করার শাস্তি কার্যকরী করা যাবে না, করলেও রক্ষা নেই।

এখন ভেবে দেখার দরকার, আল্লাহর পয়গম্বর তথা আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের আয়ত্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা না থাকলে আল্লাহরহুকুম পালন করাও বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানরা নিজেদেরকে হুকুমের দাস হিসেবে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। এখন সেই হুকুমই যদি পালন করা না যায়, তাহলে মুসলমান হিসেবে টিকে থাকা যায় কিভাবে? ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়, আনুষ্ঠানিক ইবাদতের ব্যাপারে ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন পড়ে। নামায, রোযার মতো অত্যাবশ্যকীয় ইবাদত ও ঐচ্ছিকরূপ ধারণ করে যদি রাষ্ট্রশক্তি এসব ইবাদত পালনে পৃষ্ঠপোষকতা করা থেকে হাত গুটিয়ে রাখে। রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায়ই জনসাধারণের মধ্যে ইসলামী আদর্শের জ্ঞানদান করা সহজ হয় এবংতাদের মধ্যে তাকওয়া পরহেজদারী সৃষ্টির পথ সুগম হয়।

অন্যদিকে বাতিল পন্থীদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকলে তারা ইসলামী শিক্ষাদীক্ষা চালূ করা তো দূরের কথা, এসব শিক্ষাকে মিটিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করে। ফলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মানুষ ইসলামী জ্ঞানের অভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং আমলের দিকে দিয়ে কাফের-মোশরেকদের চেয়ে কোন অংশেই ভালো থাকে না। কাজেই ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা চালূ রেখে মুসলমানদেরকে সঠিকভাবে দ্বীন পালনের যোগ্য করে তৈরী করা কেবল ইসলামী সরকারের অধীনেই সম্ভব হয়। অন্যদিকে বাতিল সরকারের অধীনে থেকে সঠিক জ্ঞানের অভাবে বিপথগামী হয়ে পড়লে মুসলমান নামধারী হয়েও দুনিয়া ও আখেরাতে গজবে পতিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সুতরাং এসব ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক ক্ষমতার গুরুত্ব অপরিসীম।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সুদের পরিবর্তে যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালুর নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যবস্থা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা দ্বারা কতটুকু কার্যকরী করা সম্ভব? রাষ্ট্রশক্তি যদি সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে ও প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায় এবং যাকাত পদ্ধতি চালু না করে, তবে শত চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা এ ব্যবস্থা সমাজে চালু হতে পারে না

www.bjilibrary.com

বিক্ষিপ্তভাবে চালুর চেষ্টা হলেও ব্যক্তি ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করতে পারে। ব্যক্তি বিশেষ সুদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে। এতে সরাসরি যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তি প্রদানকারী ব্যক্তির নিকট দুর্বল হয়ে পড়ে। এভাবে যাকাতভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে না এবং সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থাও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং এ দুটো প্রয়োজন পুরা করতে রাষ্ট্রশক্তি অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ইসলামবিরোধী আদর্শ ও শক্তির মোকাবিলা করে আল্লাহর দ্বীনি ব্যবস্থায় টিকিয়ে রাখার ব্যাপারেও রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মহানবী (সাঃ) সেনাবাহিনী কাজে লাগিয়ে লড়াই সংগ্রামের দ্বারা ইহুদী ও মুশরেকদের আক্রমণ থেকে মুসলিম সমাজকে হেফাজত করেছিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারী ও ভন্ড নবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলামের বিশুদ্ধতা টিকিয়ে রেখেছিলেন।

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন, "তিনিই মহান আল্লাহ যিনি সত্য দ্বীন ও হেদায়েত সহকারে রাসূল প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি এ দ্বীনকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করে দেন, এতে মুশরেকরা যাই-ই মনে করুক না কেনো।" (আস সফ ঃ ৯)। তাই মহানবী (সাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের খলিফাগণ (রাঃ) পার্শ্ববর্তী অমুসলিম শাসকদের দূতের মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন আল্লাহর দ্বীন কবুল করুন, নতুবা জিজিয়া কর দিন, তা না হলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

বলা বাহুল্য, মানুষের প্রভূত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্তই প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যতীত এ কাজ মোটেই সম্ভব নয়। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'ইন্নাদ্বীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন। আল্লাহর এ ঘোষণা মুসলমানদেরকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। তাহলে একথা মানতেই হবে যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীনের অনুসরণকারী পরকালে মুক্তি পাবে না। পরকালে মুক্তি না পেলে অনন্তকাল ধরে মানুষকে সীমাহীন কষ্টের মধ্যে কাল কাটাতে হবে। বাতিল রাষ্ট্রশক্তি ইসলাম কবুল করার ব্যাপারে অমুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য সবচেয়ে বড় বাধা। এ শক্তিকে পদানত করে আল্লাহর দ্বীন কবুলের ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীন করতে ইসলামী রাষ্ট্র শক্তির বিকল্প নেই।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুসলমানদেরকে বলেছেন, "কুনতুম খায়রা উম্মাতি উখরিজাত লিন্নাছি তামুরুনাবিল মারুফি ওয়াতান হাওনা আনিল মুনকার ওয়া তুমিনুনা বিল্লাহ"। অর্থাৎ তোমরা সর্বোত্তম জাতি, সকল মানুষের জন্য তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।

আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করতে হলে সকল মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দান এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার কাজ মুসলমানদেরকে করতে হবে। রাষ্ট্রক্ষমতা প্রযোগ ব্যতীত এ কাজ সম্ভব নয়। সর্বোপরি মুসলমান সমাজকে সৎ ও খোদাভীরু হিসেবে গড়ে তুলতে হলে পরিকল্পনা মাফিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা দরকার। যে ব্যবস্থা দ্বারা মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভ করতে পারবে এবং আল্লাহর আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তা মেনে চলার জন্য প্রস্তুত থাকবে। এ কাজ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনের জন্য জিহাদ করা মুসলমানদের জন্য এক অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বহুসংখ্যক আয়াত দ্বারা তার কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্বের কথা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা গেলো-

www.bjilibrary.com

"তুমি কি জানো না যে আসমান যমীনের রাজত্ব আল্লাহর?" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১০)
"এবং রাজত্বে তার কোন শরীক নেই।" (আল ফোরকান ঃ ২)
"আল্লাহ ছাড়া ফায়সালার ইখতিয়ার কারো নেই।" (আল-আম ঃ ৫৯)
"তারা বলে আমাদের ইখতিয়ারের মধ্যে কিছু আছে কি? বলো ইখতিয়ার সর্বোতভাবে আল্লাহর।" (আল-ইমরান ঃ ১৫৪)
"ইখতিয়ার আল্লাহর হাতে শুরুতেও এবং শেষেও।" (আর-রুম ঃ ৪)
"তিনিই তো তার বান্দাদের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী, কর্তৃত্বের মালিক। তিনি মহাজ্ঞানী। সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত।" (আন-আম ঃ ১৮)
"বলো হে খোদা! রাজ্যাধিপতি! যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করো; আর যার কাছ থেকে খুশী রাজ্য ছিনিয়ে লও। যাকে খুশী সম্মান দাও, যাকে খুশী অপমান করো। সকল কল্যাণ তোমার ইখতিয়ারাধীন। তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" (আল-ইমরান ঃ ২৬)
"আল্লাহ ছাড়া আর কারো নির্দেশ নেই। তার ফরমান যে তোমরা তার ছাড়া আর কারো বন্দেগী করো না। এটিই তো দ্বীনে কাইয়েম-সত্য সঠিক জীবন বিধান, কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।" (ইউসুফ ঃ ৪০)
"সাবধান! সৃষ্টি তার নির্দেশ ও তারই।" (আল-আরক ঃ ৫৪)
"চোর নারী হোক পুরুষ হোক, উভয়ের হাত কেটে দাও। তুমি কি জানো না যে আসমান-যমীনের বাদশাহী আল্লাহরই জন্য?" (আল-মায়েদা ঃ ৩৮-৪০)

ইসলামী ও অনৈসলামী রাজনীতির পার্থক্য

প্রিয় পাঠক, নিশ্চয়ই একথা ভুলে যাননি যে, শুধু আল্লাহর উলুহিয়াত বা সার্বভৌমত্ব সমাজে প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামী রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য এবং কালেমা তাইয়্যেবার ঘোষণা দিয়েই ঈমান গ্রহণকারীরা মূলতঃ এ কাজের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে থাকেন।

এখন ভেবে দেখা দরকার, কিভাবে আল্লাহর উলুহিয়াত প্রতিষ্ঠার দ্বারা মানব গোষ্ঠীর প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। প্রথমেই আমরা পার্থিব কর্যাণের বিষয়টাই ভেবে দেখি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিখিল বিশ্বের সবকিছুর সাথে মানুষেরও স্রষ্টা। যেহেতু তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাই মানব প্রকৃতির দাবী পূরণকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে বেশী অবহিত। মানুষের সমাজ পরিচালনার জন্য তিনি যে আইন-কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা মানব রচিত সকল আইন-কানুনের চেয়ে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। এর কারণ হচ্ছে ঃ

(ক) মানুষের জন্য তিনি যে আইন-কানুন নাযিল করেছেন তা সকল মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। যেহেতু এ আইন কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠীর দ্বারা রচিত নয়। তাই কোন মানবগোষ্ঠীই এ আইনের ঊর্ধে থাকতে পারে না। ফলে এ আইনের দ্বারা সকল মানুষের অধিকার সমানভাবে সংরক্ষিত হয়। এ আইনের প্রয়োগকারীরা আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী থাকার কারণে নিষ্ঠার সাথে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করে থাকেন। এভাবে নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে অপরাধ সংঘটিত হয় না, ফলে মানুষ শান্তি-শৃঙ্খলার মধ্যে বসাবস করতে পারে।

www.bjilibrary.com

(খ) ইসলামী রাজনীতি মানব জীবনের সকল প্রকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিতে চায়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ইসলাম সুদভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সুদ, ঘুষ, জুয়া, ফটকাবাজী, অধিক মুনাফাখোরী ইত্যাকার সর্বপ্রকার শোষণমূলক ব্যবস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করে এসবের মূলোৎপাটন দ্বারা শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ করতে চায়; যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে এক শ্রেণীহীন মানব সমাজ রচনা করতে চায়। এ সমাজে যেমনি থাকে না দরিদ্রের হাহাকার, তেমনি থাকে না ধনীর ধন সংরক্ষণের অহেতুক মাথা ব্যথা।

(গ) জ্বেনা, ব্যাভিচার, মদ, মাতলামির বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা এসব অপকর্ম সমাজ থেকে উৎখাত করে মানব সমাজকে পবিত্র রাখার ব্যবস্থা করে ইসলাম। অসামাজিক কাজের দ্বারা সমাজে হিংসাদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে খুনাখুনি পর্যন্ত ঘটতে পারে, তাছাড়া সমাজ পাপাচারে কুলষিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে ইসলামী আইনের সঠিক প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই। এ ছাড়াও খোদাভীরু চরিত্রের মানুষ ইসলামী রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন বলে আল্লাহর ভয়ে তারা নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন। তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও সরকারী সম্পদ-সম্পত্তিকে পবিত্র আমানত হিসেবে তারা গণ্য করেন। ফলে লোপাটের পরিবর্তে সরকালী সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সঠিকভাবে পালিত হয়। এতে দেশের সম্পদ পাচার বন্ধ হয়ে যায় এবং দেশবাসী ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। সরকারী ক্ষমতা দখলকারী গোষ্ঠী রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার সুযোগ পায় না বলে এভাবে ধনী-দরিদ্রেল আকাশচুম্বী ব্যবধানও সৃষ্টি হয় না। ইসলামী সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্টিত থাকলে খোদাভীরু মানসিকতাসম্পন্ন লোকেরা সরকারী দায়িত্ব পালন করেন বলে এমন আরো অসংখ্য কল্যাণ লাভ করতে পেরে সমাজের মানুষ পরম শান্তিতে জীবনযাপনের সুযোগ লাভ করে।

(ঘ) ইসলামী রাষ্ট্রে কোন বড় পদে মানুষের কাছে ভোট চাওয়ার অধিকার থাকে না, বরং মানুষ যাকে চায় তাকেই নেতা বানায়। এতে সমাজের প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিরাই নেতৃত্ব লাভ করে থাকেন। পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুযায়ী সকল মানুষের নেতা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার স্বীকৃতি থাকে ও এ অধিকার কার্যত লাভ করা বহু যোগ্য মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব হয় না। এ ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ সকল নাগরিকের থাকে বিধায় জনসাধণের মতামত নিজের পক্ষে নেবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে থাকে।

এ ব্যাপারে প্রচার প্রপাগান্ডা চালানো নিজের পক্ষে জনমত ধরে রাখতে ভাড়াটিয়া নিয়োগ, প্রয়োজনে মানুষকে বস্তুগত লাভ দিয়ে পক্ষে আনা ইত্যাদি ব্যাপারে একজন প্রার্থীর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। অনেক যোগ্য ব্যক্তির এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ থাকে না বিধায় তিনি নেতা নির্বাচিত হতে পারেন না। অন্যদিকে, অর্থের মালিক অযোগ্য ব্যক্তি বা কালো টাকা উপার্জনকারী অসৎ ব্যক্তি নেতা নির্বাচিত হয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তিরা যে অর্থ খরচ করে নেতা হয়, ক্ষমতা গ্রহণ করার পর লাভে আসলে তার বহুগুণ সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করে পুষিয়ে নেয়। ফলে জনকল্যাণমূলক কাজের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এভাবে অযোগ্য লোক নির্বাচিত হলে তো উন্নতির বদলে

www.bjilibrary.com

সমাজব্যবস্থার অবনতিই ঘটে। মানুষের উদ্ভাবিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারই যখন এই অবস্থা তখন একনায়কতন্ত্র ও অন্যান্য তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে সামাজের কল্যাণ খুব কমই আশা করা যায়। সুতরাং নেতা নির্বাচনের ইসলামী পদ্ধতিই মানব সমাজের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর। এতো গেলো পার্থিব কল্যাণ সম্পর্কিত ইসলামী বিধানের উপকারিতার বিবরণ।

এখন পারলৌকিক কল্যাণ সম্পর্কে ভেবে দেখা যাক। মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীন পবিত্র কুরআনে হযরত আদম (আঃ)কে বলেছেন, "আমি বললাম যে, তোমরা সকলেই এখান থেকে নেমে যাও। অতপর আমার নিকট থেকে যে জীবন বিধান তোমাদের নিকট পৌছবে, যারা আমার সেই বিধান মেনে চলবে, তাদের জন্য কোন চিন্তা-ভাবনার কারণ থাকবে না। আর যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে এবং আমার বাণী ও আদেশ–নিষেধকে মিথ্যা মনে করবে, তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামী হবে এবং সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।" (বাকারা ঃ ৩৮-৩৯)

আল্লাহর এই ঘোষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বেশী বলার প্রয়োজন পড়ে না। এ দুটি আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আদেশ-নিষেধ মানুষের জন্য নাযিল হয়েছে, তা মেনে চললে পরকালীন জীবন হবে সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনামুক্ত অর্থাৎ অনন্তকালীন সুখময় জীবন লাভ করা যাবে। অন্যদিকে, আল্লাহর যে কোন আদেশ–নিষেধকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করলে অনন্তকালীন জীবনে জাহান্নামী হতে হবে। এখন ভেবে দেখা দরকার যে, আল্লাহ প্রদত্ত ফৌজধারী দেওয়ানী আইনের আয়াতগুলো মেনে তা কার্যকরী করা রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যতীত আদৌ সম্ভব হয়কি? কখনই নয়। আর তা করা না গেলে আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে পারলৌকিক কঠিন শাস্তি পাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। তাহলে এ কথা পরিষ্কার যে, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা মানুষের পরকালীন জীবন সুখময় করার পথ সুগম করে। সুতরাং একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, ইসলামী রাজনীতির অনুশীলন মানুষের ইহলোক ও পরলোকের জীবনে অফুরন্ত কল্যাণ লাভের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে।

অতপর অনৈসলামিক রাজনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক। এ রাজনীতির আইন-কানুন মানুষের দ্বারা রচিত, তাই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া এ আইনের পক্ষে সম্ভব নয়। মানব সমাজের একটি বিশেষ অংশের দ্বারা এ আইন রচিত এবং একটি বিশেষ গোষ্ঠী তা সমাজে প্রয়োগ করে থাকে। আইন রচনাকারী ও প্রয়োগকারী গোষ্ঠী চায় নিজেরা এ আইনের ঊর্ধে থাকতে। তাই তারা গোটা মানব সমাজের জন্য নিরপেক্ষ আইন তৈরী করতে ব্যর্থ হয়।

আর পক্ষপাত দুষ্ট আইন দ্বারা সুখী সমাজ গড়া যায় না। খোদা বিমুখ রাজনীতিবিদরাই এসব আইনের রচয়িতা ও প্রয়াগ কর্তা হয় দুনিয়ার কার্যকলাপের জন্য তারা আখেরাতে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করার চিন্তামুক্ত থাকে বলে মানব চক্ষুর অন্তরালে থেকে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য অনেক অকাজ-কুকাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা মানুষের কল্যাণে কাজ না করে নিজের আখের গোছানোর জন্য কাজ করে থাকে, আর এতে সমাজের মানুষ হয় বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত।

প্রশ্ন উঠতে পারে, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত শাসকগোষ্ঠী জনগণের বিরুদ্ধে যাবে কেন? জবাব হচ্ছে, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত শাসকরা ক্ষমতায় থাকলেও জনগণের

www.bjilibrary.com

তৈরী আইন-কানুন দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা করে না। কার্যতঃ জনগণের দ্বারা আইন রচনা করা সম্ভবও নয়; আইন রচনা মুষ্টিমেয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই করে থাকেন আর তারাই সেই গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থই সংরক্ষণ করে থাকেন। এ শাসকগোষ্ঠী নিজেদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ ও ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ও তা বজায় রাখতে সকল প্রকার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন। এতে জনগণের যতো ক্ষতিই হোক না কেনো, তাতে তাদের কোন মাথা ব্যথা থাকে না। সুতরাং তাদের দ্বারা মানুষের কল্যাণ হবে কেন? তারা তাদের গোষ্ঠী স্বার্থ সংরক্ষণকরতে অন্যের উপর সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার চালিয়ে যেতে কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করবে না।

সুদ, ঘুষ, জ্বেনা, ব্যাভিচার প্রতিরোধের বাস্তব কোন ব্যবস্থা তো করেই না,বরং নিজেরাই এসব কাজে জড়িয়ে পড়ে। তাই এহেন রাজনীতিবিদরা সমাজের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলকরে থাকলে মানুষ যেমন পার্থিব জীবনে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, তেমনি পাপাচারে ডুবে থাকার কারণে পরলোকেও শাস্তিরযোগ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং অনৈসলামী রাজনীতি মানুষকে উভয় সংকটে ফেলে।

অন্যান্য ধর্মে রাজনীতি নাই কেন?

সুধী পাঠক, নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসারী হওয়ায় দাবীদারগণ নিজদিগকে ইহুদী এবং হযরত ঈসা (আঃ) এবং অনুসারী হওয়ার দাবীদারগণ নিজদিগকে খৃস্টান ধর্মাবলম্বী বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর এ দু'মহান পয়গাম্বর আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত হয়েই মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান জানিয়ে গেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে দ্বীনের কাজ করে গেছেন, উল্লিখিত মহান পয়গাম্বর (আঃ)দ্বয় একই দ্বীন আল-ইসলামের খেদমত করে গেছেন। হযরত মূসা (আঃ) ইসরাইল সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দানকালে সেই জনগোষ্ঠীকে পরিচালনা করতে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি তার অধীনস্থ মানবগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহর নিকট থেকে যে শরীয়ত লাভ করেছিলেন, তা সেই সমাজের দাবী পূরণের জন্য যথেষ্ট ছিলো। একথা নিশ্চিত যে, তৎকালীন মানবগোষ্ঠীকে পরিচালনার জন্য অবশ্যই রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের প্রয়োজন পড়তো এবং হযরত মূসা (আঃ) যে শরীয়ত লাভ করেছিলেন, অবশ্যই তার মধ্যে রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। ব্যাভিচারের শাস্তি সংগেসার করার বিধান তৌরাত কিতাব থেকেই গ্রহণ করা হয়েছিলো।

হযরত মূসা (আঃ) কালেমা তাইয়্যেবাই প্রচার করেছিলেন এবং এই কালেমার শিক্ষাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ আল্লাহর কর্তৃত্ব, সার্বভৌমত্ব যমীনে কায়েম করতে চেয়েছিলেন। এ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ অবশ্যই চালাতে হয়েছিলো। আল্লাহর প্রত্যেক পয়গাম্বরই কালেমা তাইয়্যেবা অর্থাৎ আল্লাহর কর্তৃত্ব মেনে নেবার জন্য আহবান জানিয়ে গেছেন। সে কারণেই সমকালীন বাতিল শাসকগোষ্ঠী পয়গাম্বরদের বিরোধিতায় সর্বশক্তি নিয়ে খাড়া হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) এই কালেমার দাওয়াত নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই তৎকালীন শাসক তাকে শূলে চড়ানোর আয়োজন করেছিলো। সুতরাং একথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ প্রদত্ত সকল পয়গাম্বরের শরীয়তেই সমাজ পরিচালনার সকল আইনের সাথে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের আইনও বর্তমান ছিলো।

www.bjilibrary.com

প্রশ্ন আসে, এখন ঐসব সম্মানিত পয়গাম্বরদের রেখে যাওয়া গ্রন্থসমূহে রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও রাষ্ট্রীয় আইন সংক্রান্ত নির্দেশাবলী অবশিষ্ট নেই কেনো? কেনই বা তাদের অনুসারী হওয়ার দাবীদারগণ এখন মানব রচিত আইন-কানুনের দ্বারা সমাজ পরিচালনা করছে?

প্রিয় পাঠক, একটু কষ্ট করে যদি পবিত্র কুরআনের পাতা উল্টিয়ে দেখেন, তবে সেখানে দেখতে পাবেন সমাজ পরিচালনার সকল বিষয় সংক্রান্ত নির্দেশাবলী আল্লাহর পক্ষ থেকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। চুরির শাস্তি কি হবে, খুনের শাস্তি কি হবে, ব্যভিচারের শাস্তি কি হবে, সন্ত্রাসের শাস্তি বা কি হবে? সব খুঁজে পাবেন কুরআনের পাতায়। মহানবী (সাঃ) কুরআনের আয়াতগুলোকে ব্যাখ্যা করে নিদের্শাবলীকে আরো সহজবোধ্য করে গেছেন, যা হাদীস অধ্যায়ন করলে ভালোভাবে জানা যায়। এসব আইন-কানুন মহানবী (সাঃ) তার জীবদ্দশায় সরকারী ক্ষমতাবলে সমাজের মানুষের উপর প্রয়োগ করে দেখিয়ে গেছেন।

পরবর্তীতে সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত খুলাফায়ে রাশেদার চারজন খলিফা একইভাবে এসব আইনের প্রয়াগ-বলবৎ রেখেছিলেন। খিলাফত ব্যবস্থা রাজতন্ত্রের উত্তোরণের পর ক্রমশঃ সকল প্রকার আইন-কানুনের মধ্যে জাহেলিয়াত ঢুকতে থাকে। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমনই দাঁড়িয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বে মুসলমান অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্রে দু'একটি ব্যতীত প্রায় সকল দেশেই মানব রচিত আইন-কানুনের অনুসরণ করাহচ্ছে। মুসলমান নামধারীরা পর্যন্ত ইসলামবিরোধীদের সাথে সুর মিলিয়ে ইসলামী আইনকে সেকেলে আইন, মধ্যযুগীয় বর্বর আইন ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করছে। আল্লাহর আইনকে যারা মানতে চায়, তাদের পাশ্চাত্যের অনুসরণে মৌলবাদীবলে গালিগালাজ করছে।

তাহলে ব্যাপারটি কি দাঁড়ায়? আসলে সুবিধাবাদী চরিত্রের মানুষ চিরকালই নিজেদের সুখ-সুবিধা নিশ্চিত রাখার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে এসেছে। এরা ক্ষমতায় থেকে নিজেদের অনুকূলে আইন রচনা করে আল্লাহর আইন পরিত্যাগ করেছে। কুরআন-হাদীস ও ইতিহাসে সংরক্ষিত প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও যখন মানুষ এরূপ করতে পেরেছে, তাহলে দূর অতীতে অবতীর্ণ গ্রন্থাদির নির্দেশাবলী আর অবশিষ্ট থাকবে কিভাবে?

যে সকল গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদের পর অনুবাদ হতে থেকেছে এবং তা হয়েছেতৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে, তাহলে আর তারা তাদের স্বার্থবিরোধী আইন-কানুনকে ঐসব ঐশী গ্রন্থের পাতায় টিকিয়ে রাখবে কেন? এভাবেই অপসারিত হয়েছে ঐসব ধর্ম থেকে রাজনৈতিক আইন-কানুন এবং তার অনুসারীরা ভুলে গেছে সেসবের অনুশীলন। এমন কিছু ধর্মের অস্তিত্ব দেখা যায়, যেগুলো প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির পূজা থেকে শুরু হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে যেগুলো স্রষ্টা প্রদত্ত কোন বিধান নয় তাই এসকল ধর্মে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কিত বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরোধিতা করে কারা?

সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর মানুষ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরোধিতা করে থাকে। ১. বস্তুবাদে বিশ্বাসী নাস্তিক গোষ্ঠী। ২. ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মানুষ। ৩. মুসলমান নামধারী কিছু স্বার্থান্ধ মানুষ।

www.bjilibrary.com

১. বস্তুবাদে বিশ্বাসী নাস্তিকগোষ্ঠী আল্লাহ, ফেরেস্তা, নবী, রাসূল, কেয়ামত, দোজখ, বেহেস্ত এ সবকিছুতে আদৌ বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে, দৃশ্যমান জগতের সবকিছুই আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়েছে এবং জড় প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হচ্ছে। তাদের মতে, স্রষ্টা বা আল্লাহ বলে কিছু নেই, থাকার প্রয়োজনও নেই। এ মতের লোকেরা ধর্মকে জঞ্জাল মনে করে। তারা ছলেবলে মানুষের ধর্মবিশ্বাসই নষ্ট করে দিতে চায়, আর ধর্মীয় রাজনীতি তো বরদাস্তই করতে পারে না। ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র কুম্যুনিজমের মধ্যে সাধারণতঃ এদের রাষ্ট্রীয় দর্শন সীমাবদ্ধ থাকে।

২. ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে যেহেতু রাজনীতি সম্পর্কিত কোন নির্দেশনা আর অবশিষ্ট নেই; তাই ঐসকল ধর্মের লোকেরা ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা বিষয় বলে ধরে নেয়। তাদের ধর্মে রাজনীতি নেই বলে ইসলামের রাজনীতিকে তারা মেনে নিতে পারে না। তাই তারা রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষই দেখতে চায়। তারা বস্তুবাদীদের রাজনৈতিক দর্শনের সাথে একমত হওয়া ছাড়াও পুঁজিবাদ ও জাতীয়তাবাদের অনুবর্তী হয়ে থাকে।

৩. মুসলমান নামধারী কিছুসংখ্যক মানুষ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে এবং পার্থিব স্বার্থের মোহে পড়ে ইসলামী রাজনীতির বিরোধিতা করে থাকে। মোটামুটি তিনটি কারণে এরা এ ধরনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। (ক) দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব, (খ) কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের মোহ, (গ) ইসলামবিদ্বেষী পরাশক্তিগুলোর ক্রীড়নক হিসেবে নিযুক্তি লাভ।

(ক) নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের মধ্যেই ইবাদতের সকল আনুষ্ঠানিকতা সীমাবদ্ধ থাকে বলে অনেক মুসলমানের ধারনা। বস্তুবাদী রাজনীতির চেহারা দেখতে দেখতে অনেকের ধারণা জন্মেছে যে, আসলে রাজনীতি হচ্ছে জঘন্য কার্যকলাপের সমষ্টির নাম। ধোকাবাজী, মিথ্যাচারিতা, খুনখারাবী, লুটপাট ইত্যাদি কাজের দ্বারা দুনিয়াদার রাজনীতিবিদগণ ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে থাকে, আর যেহেতু পবিত্র ইসলামে এসব ঘৃণ্য কাজের ঠাঁই নেই, তাই তারা মনে করেন ইসলাম ধর্মে রাজনীতি নেই। তারা কুরআন-হাদীস সবিস্তারে অধ্যয়ন করে দেখেন না বা মহানবী (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদার খলিফাগণের (রাঃ) জীবনেতিহাস অধ্যয়ন করেন না যাতে ইসলামী রাজনীতির পবিত্রতা ও কল্যাণকামী সমাজ গঠনে ইহার আবশ্যকতা সম্পর্কে তাদের পূর্ণ ধারণা জন্মাতে পারে। এসব ব্যাপারে অজ্ঞ থাকার কারণে আজ তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা পোষণ করেন না এবং ইসলামী রাজনীতি চালু করতে পারলে যে সকল প্রকার ভন্ডামীর রাজনীতি সমাজ থেকে দূরীভূত হয়ে যায় এবং সুন্দর সুখময় কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করা যায়, তা তাঁরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন। এ কারণেই তারা ইসলামের রাজনীতি থাকতে পারে না বলে বিশ্বাস করেন এবং ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী শিবিরে স্থান করে নেন।

(খ) ইসলামী আইন-কানুন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর (Vested interest group) অবৈধ সুযোগ-সুবিধা হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিধায় তারা মুসলমান নামধারী হওয়া সত্ত্বেও সর্বশক্তি নিয়োগ করে এ আইনের বিরোধিতা করে। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতের মতো আনুষ্ঠানিক ইবাদতে তাদের

www.bjilibrary.com

গায়ে আঁচও লাগে না বলে এসবের বিরুদ্ধে তাদের কোন ভূমিকা থাকে না। বরং ইসলামী আইনকে রুখতে এগুলোর প্রতি জোর দিয়ে ধর্মভীরু সাজে।

কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) শাসক শ্রেণী, (২) ধনিক শ্রেণী, (৩) ধর্ম ব্যবসায়ী।

(১) ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় খোদাভীরু, চরিত্রবান ও জ্ঞানী মানুষের হাতেশাসন ক্ষমতা আসে এবং চরিত্রহীন ও খেয়ানতকারীদের ক্ষমতা থেকে অপসারিত হতে হয়। সুদ, ঘুষ, লুটপাট ও জ্বেনা ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকা শাসক চক্র তাদের বিলাস বহুল জীবনের অবৈধ সুযোগ-সুবিধা কামড়ে ধরে থাকতে চায়। তাই তারা মরিয়া হয়ে ইসলামী আইনের বিরোধিতা করে।

(২) অবৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থ হাতছাড়া হওয়ার ভয় এবং আরো উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার হুমকি ধনিক শ্রেণীকে ইসলামী আইনের বিরোধী করে তোলে। ধর্মভীরু সাজতে পীরের দরবারের ঘোরাফিরা ও ভেট দেবার কাজ করা ছাড়াও তসবীহদানা হাতে নিয়ে চলতেও তারা প্রস্তুত, কিন্তু ইসলামী আইন সহ্য করতে একেবারেই নারাজ।

(৩) শাসকগোষ্ঠী ও ধনিক শ্রেণী কর্তৃক প্রদত্ত কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে ধর্ম ব্যবসায়ীরা ইসলামী আইনের বিরোধী শিবিরে অবস্থান গ্রহণ করে। বিনা পরিশ্রম বা স্বল্প পরিশ্রমের বিনিময়ে আয়েশী জীবনযাপনের সুযোগ নষ্ট হওয়ার আশংকায় তারা এরূপ করে থাকে।

(গ) এ ছাড়াও একটি শক্তিশালী চক্র ইসলামী রাজনীতির বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। এরা হচ্ছে সেইসব ইসলামবিদ্বেষী পরাশক্তির নিযুক্ত এজেন্ট যারা পৃথিবী থেকে ইসলামের আলো নিভিয়ে দেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মুসলমান নামধারী এসব এজেন্টরা প্রভূদের অর্থে বিলাসী জীবনযাপন করে, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পরিচিতিও পায়। তাই তারা প্রভুদের তুষ্ট করতে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কর্মসূচী দিয়ে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

বিরোধিতার ধরণ

যারা দ্বীনের সঠিক জ্ঞানের অভাবে ইসলামী আইনের বিরোধিতা করে তারা সাধারনতঃ ধর্ম ব্যবসায়ী ও পরাশক্তির এজেন্টদের খপ্পরে পড়ে তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে থাকে। তাই তাদের বিরোধিতার নিজস্ব কোন ধরন নেই। ধর্ম ব্যবসায়ীরা সাধারনতঃ ফতুয়া বাজীর দ্বারা জনগণকে ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলতে চায়। অলিক কাহিনী সম্বলিত হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে বিতরণ, মৌখিক আলোচনার দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করা, ধর্মগুরু হিসেবে ইসলামী রাজনীতি প্রতি শিষ্যদের ঘৃণা জন্মাইয়া দেয়া ইত্যাকার পদক্ষেপের দ্বারা এ গোষ্ঠী তাদের উদ্দেশ্য সাধন করে। পরাশক্তির এজেন্টরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে স্থান করে নিয়ে সেসব দলের দ্বারা কর্মসূচী দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের পথে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে।

পরাশক্তির পয়সায় নিত্যনতুন পত্রিকা বের করেও রেডিও, টেলিভিশনে সমগোত্রীয়দের কাজে লাগিয়ে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারিতার ঝড় তুলে এ আন্দোলনকে রুখতে চায়। অন্যান্য সকল গোষ্ঠীর চেয়ে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার পথে এরাই সবচেয়ে বড় বাধা। বড় বড় রাষ্ট্রশক্তি পেছনে থাকার কারণে এরা

www.bjilibrary.com

বেপরোয়াভাবে কাজ করে। আধুনিক প্রচার মাধ্যমের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে এরা পুরাদমে অপপ্রচার চালায়।

ইসলামবিরোধীরা মুসলমানদের যে ক্ষতি করেছে

কিছুদিন আগে একটি সমাবেশে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে লন্ডন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর ডক্টর মানাজির আহসান বলেন, "লন্ডনে কয়েক দশক পূর্বে খৃস্টান ও ইহুদী দার্শনিকদের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'ইসলামের জাগরণ ও তা রোধের উপায়' ছিলো এ সভার আলোচ্য বিষয়। ইহুদী খৃস্টানদের সবচেয়ে বড় বড় পন্ডিতদের আগমন ঘটেছিলো সেখানে। এসব পন্ডিতদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দার্শনিক চিলেন মিঃ কারাগী ফাও। বিষয়টির উপর জ্ঞানগর্ভ আরোচনা অনুষ্ঠিত হয়। মিঃ ফাও ছিলেন শেষ বক্তা। তিনি ইসলামের জাগরণ ও বিশ্বে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বড় আশংকার কথা ব্যক্ত করেন। এ আশংকা প্রতিহত করার জন্য তিনি তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেন।

(১) মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রকট করে দিতে হবে। (২) ফিরকাবাজীর দ্বারা পরস্পরের মধ্যে পুরা মাত্রায় বিভেদ সৃষ্টি করতে হবে। (৩) সুফী ইজমকে উৎসাহিত করে মুসলমানদের রাজনীতি বিমুখ করতে হবে। বলা বাহুল্য মিঃ ফাওয়ের পেশকৃত তিনটি পদক্ষেপ মুসলমানদের দমন করার জন্য যথেস্ট যদি এগুলোকে বাস্তব কার্যকরী করা যায়। এখন ভেবে দেখা যাক, পৃথিবীতে এগুলো কতদূর কার্যকরী হয়েছে বা আদৌ হয়েছে কিনা।

প্রথমে আমরা জাতীয়তাবাদের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করি। ইসলামের সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সেখানকার মানুষদের আদর্শবাদী মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। সেই মুসলমানদের উত্তরসূরীরা আজ ইসলামের আদর্শবাদ পরিত্যাগ করে জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করেছে। তারা তাদের স্বদেশী অমুসলমানদেরকে যতো আপনভাবে বিদেশী মুসলমান ভাইদেরকে সে রকম ভাবতে পারছে না। কম্যুনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যে ছয়টি মুসলিম দেশ জন্মলাভ করেছে তা সবই আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। বাংলাদেশের মুসলমানদের বাঙালী জাতীয়তাবাদ গ্রহণে বাধ্য করতে উঠেপড়ে লেগেছে মুসলমান নামধারীরাই। এভাবে প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশেই শাসকগোষ্ঠী ইসলামী আদর্শবাদের পরিবর্তে স্বদেশী বা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে আঁকড়ে ধরেছে। এরই ফলশ্রুতিতে দেখা গেলো, বসনিয়া হারজেগোভিনায় হাজার হাজার মুসলমানদের শিয়াল-কুকুরের ন্যায় নিধন করা হচ্ছে, লাখ লাখ মুসলমানদের ঘরছাড়া করা হলো, অগণিত মুসলমান মা-বোনদের পিতা ও স্বামীর সামনেই ধর্ষণ করা হলো অথচ বিশ্বের মুসলমান দেশগুলোর শাসকদের অন্তরে আশানুরূপ প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত হয়নি। তাঁরা সামান্য আহাজারি ও সমবেদনা পর্যন্ত দেখাতে পারেন না। ভারতে মুসলমানদের কচুকাটা করা হচ্ছে,সাড়ে চারশ' বছরের পুরাতন ঐতিহ্যবাহী মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে মন্দির গড়া হলো অথচ সামান্য নিন্দাবাদ জানিয়েই বিশ্বের মুসলমানরা দায়িত্ব পালিত হয়েছে বলে মনে করছে। জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের কোথায় নিয়ে গেছে, তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। ইহুদী-খৃস্টানরা তাদের স্বার্থের ব্যাপারে বড়ই সতর্ক।

www.bjilibrary.com

ইসরাইল জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করলেও তাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। কারণ পৃথিবীর সকল মুসলমানদের জীবনের বিনিময়ে হলেও আমেরিকা ইসরাইলের স্বার্থের বিরুদ্ধে আদৌ পা বাড়াবে না। পৃথিবীর সোয়াশ' কোটি মুসলমান জাতীয়বাদ কবুল করার কারণে আজ ইহুদী-খৃষ্টান ও অন্যান্য অমুসলমানদের হাতে যেভাবে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হচ্ছে তাতে মনে হয় জাতীয়তাবাদের ভূত তাদেরকে চরম আযাবে নিক্ষেপ করেছে।

এরপর ফিরকাবাজী সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক। আমাদের দেশের খবর হচ্ছে এখানে আহলে হাদীস বা সালাফী, হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ইত্যাদি মাযহাবের অনুসারীরা যেমন নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে চলতে অভ্যস্ত এবং নিজেদের মতামতকে অন্যদের উপর বিজয়ী করার কাজে লিপ্ত তেমনি পীরপন্থী ও অপীরপন্থীরা একে অপরের বিরুদ্ধে ফতুয়াবাজীতে আদাপানি খেয়ে লেগে আছে বলে মনে হয়। তারা একে অপরকে ইসলাম থেকে খারিজ করতেও কসুর করে না। সুযোগ পেলে মনে হয় একে অপরকে জবাই করে মনের ঝাল মেটাতো।

তাদের কেউ কেউ ইসলামের পাড় দুশমন নাস্তিকদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেও নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে বদ্ধপরিকর। এ খেলা শুধু আমাদের দেশে নয়, বরং সারা পৃথিবীব্যাপী চালু হয়ে গেছে। আমেরিকার ইসলামী আন্দোলনের নায়েবে আমীর জনাব নাসিম এক আলোচনায় উল্লেখ করেন, আমেরিকাতে পাকিস্তানী মসজিদ, সৌদি মসজিদ ইত্যাদি আকারে মসজিদগুলোকে ভাগ করে রাখা হয়েছে। যাতে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠতে না পারে। এভাবে দেখা যায়, যেখানে মুসলমান বসতি আছে, সেখানেই ফিরকাবাজীর বীজ শক্তভাবে পুতে দেয়া হয়েছে।

এরপর সুফী ইজম সম্পর্কে ভেবে দেখা যাক। দুনিয়ার কাজ-কারবারের সাথে ইসলামকে না জড়িয়ে শুধু আত্মার উন্নতির নামে চেষ্টা-সাধনা করাই সুফীদের মত। রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিকতাকে তারা দুনিয়াদারী ভেবে এসব থেকে হাত গুটিয়ে রাখতে চায়। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থই হচ্ছে মুসলমানদের পৃথিবীর নেতৃত্ব ও পথ প্রদর্শনের কাজ থেকে হাত গুটিয়ে ফেলা।

এটা সম্ভব হলে পৃথিবীর শাসনভার অমুসলিমদের হাত থেকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। মুসলমানদের মধ্যে এ প্রক্রিয়া ভালোভাবেই চলছে। এ কাজ ছোট ছোট অঞ্চলভিত্তিক দলের ন্যায় বিশ্বজোড়া বড় দলকেও নিরলসভাবে করতে দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি এ দেশের একটি বামপন্থী জাতীয় দৈনিকে ভারতের একজন বিখ্যাত পীর ও কংগ্রেস নেতা ইসলামে পাওয়ার পলিটিক্স এর স্থান নেই বলে প্রবন্ধ লিখেছেন। সুতরাং মিঃ কারাগী ফাওয়ের পরামর্শ যে ইসলামবিরোধী শক্তি লুফে নিয়ে বাস্তাবে প্রয়োগ করে চলেছে, তার প্রমাণ ভালোভাবেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সে সাথে এটাও লক্ষণীয় যে, পৃথিবীর মুসলিম অধ্যুষিত প্রায় সকল দেশেই সরকার ও ইসলাম বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সমানভাবে ইসলামী সংগঠনের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করে যাচ্ছে। এতে বুঝা যায়, ঐ অশুভ শক্তিগুলো মিঃ ফাওয়ের পরামর্শ তো কার্যকরী করছেই, উপরন্ত মুসলিম দেশের ক্ষমতাসীন সরকার ও ইসলামবিরোধী দলগুলোকে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করছে।

www.bjilibrary.com

এখন শতধা বিভক্ত নিপীড়িত নির্যাতিত বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থাই করুন। এ অবস্থা চলতে থাকলে বিশ্ববাসীর নিকট এ জাতি বর্ণ হিন্দুদের তুলনায় শূদ্রদের থেকে বেশী মর্যাদার অধিকারী হবে না। অথচ ভাবতে বিস্ময় লাগে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত মুসলমানরাই পৃথিবীর বিরাট বিরাট এলাকা শাসন করে এসেছে। তারা জ্ঞানে-গুণে-মানে, ক্ষমতা-প্রতিপত্তিতে পৃথিবীতে ছিলো অদ্বিতীয়। এখন কোন্ বস্তু হারিয়ে এ জাতির এমন অধঃপতন হলো তা ভেবে দেখা দরকার।

ইসলামবিরোধীরা মুসলমানদের কিভাবে ব্যবহার করে

মুসলমানরা কেন তাদের শত্রুদের প্রতিনিধি হয়ে নিজেদের সর্বনাশে লিপ্ত হচ্ছে? এসব প্রতিনিধি ও তাদের নিয়োগ কর্তাদের কৌশল ধরতে না পেরে সাধারণ মুসলমানরা কেন ধোকায় পড়ছে? পৃথিবীর ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করার পরও এরা কেন সম্বিৎ ফিরে পাচ্ছে না? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। দেখতে হবে আসল গলদ কোথায়?

ইসলামের দুশমনরা মুসলমানদেরকেই ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে প্রধানত নিতটি নগদ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে। ১। অর্থ দিয়ে বশ করে, ২। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রলোভন দেখিয়ে, ৩। অবাধ যৌন সম্ভোগের সুবিধা সৃষ্টিকরে।

উপরোল্লিখিত তিনটি সুবিধাই একযোগে লুফে নিয়ে ইসলামের দুষ্মনদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধিতে পরিণত হয় প্রধানত অনৈসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান নামধারীদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক মানুষ। এরা মুসলমান হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেও ইসলামের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে ইসলাম সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে না বিধায় এ সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যায়। ইসলামী আদর্শের অনুসরণ থেকেও এরা অনেক দূরে অবস্থান করে। তাই দুনিয়ার জীবন ভোগ করার নেশা এদের পেয়ে বসে। সে কারণে ভালো-মন্দ বাছবিচার ছাড়াই উল্লিখিত তিনটি টোপ তারা গিলে বসে।

ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত আদর্শচ্যুত কিছু ব্যক্তিকে সামান্য অর্থের বিনিময়েই ইসলামের দুশমনদের খাস গোলামে পরিণত হতে দেখা যায়। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমান হিসেবে ঈমানের দাবী পূরণের ব্যাপারে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সামান্য অর্থের বিনিময়ে এসব আলেম নামধারী ব্যক্তিরা ইসলামের দুশমনদের হাতিয়ারে পরিণত হয়। মূলত এ উভয় শ্রেণীর লোকই মুসলমান নামধারী হলেও বাস্তবে ঈমানদার নয়। পার্থিব জীবনে কার্যকলাপের জন্য আখেরাতে জবাবদিহির চেতনা থেকে এরা মুক্ত। তাই ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণের বিরুদ্ধে কাজ করতে এদের বিবেকে বাধে না। এরা চায় চাকচিক্যময় দুনিয়ার জীবন।

সাধারণ মুসলমান এদের ধোঁকায় পড়ে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ার মুখ্য কারণ একটিই এবং তা হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব। আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান পোষণ করা সত্ত্বেও দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায় তারা ইসলামের দুশমন ও তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রতারিত হয়। প্রতারকরা তাদের শুভাকাঙ্খী সেজে ইসলামের প্রতি দরদী হওয়ার ভান করে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর উচ্চপ্রশংসা করতে থাকে। ইসলামের পবিত্রতা বর্ণনা করে কলুষযুক্ত রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই বলে দরদ সহকারে বুঝায়। এদের এই মেকী দরদের অন্তরালে যে ধোকাবাজী লুক্কায়িত থাকে তা এই সরলপ্রাণ মুসলমানরা ধরতে পারে না। ফলে তারা প্রতারিত হয়ে নিজেদের সংহতি বিনষ্ট করে এবং বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে মুসলিম মিল্লাতের প্রাণশক্তি বিনষ্ট করে বসে।

www.bjilibrary.com

মুসলমানদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়েও তাদের বিভ্রান্ত করছে আল্লাহর ঐ দুশমনরা। এভাবে সাধারণ মুসলমানরা দুশমনদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে দিন দিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের এ করুন পরিণতি দেখেও শিক্ষিত ও সজাগ মুসলমানরা এ অবস্থা পরিবর্তনে কেনো যে এগিয়ে আসছে না এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখা দরকার। মুসলিম দেশের শাসকগোষ্ঠীকে স্বদেশী ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদে আটকিয়ে আল্লাহর দুশমনরা সাহায্য-সহযোগিতা দান ও তা থেকে বঞ্চিত রাখার হুমকি দিয়ে তাদের পদলেহী বানিয়ে রাখে।

দেশের অপরাপর রাজনৈতিক দল ও প্রভাবশালী ব্যক্তি গোষ্ঠীকে বিভিন্ন স্বার্থ ও স্বার্থের প্রলোভন দেখিয়ে একইভাবে কবজায় রেখে মাথা তুলতে দেয় না। ফলে মুসলমানরা হাজারো বিপর্যয়েও নেতৃত্ব শূন্য থেকে দুশমনদের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের উপর চলছে নারকীয় নির্যাতন।

এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে মুসলমানদের আঞ্চলিক জাতীযতাবাদের ভূত ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলতে হবে এবং পৃথিবীর এক প্রান্তের মুসলমানদের অপর প্রান্তের মুসলমানকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বিশ্বের সকল মুসলমানকে একটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ গণ্য করতে হবে। এক অঙ্গের ব্যথা যেমন গোটা দেহকে কষ্ট দেয়, তেমনি এক প্রান্তে মুসলমানদের দুর্যোগকে অপর প্রান্তের মুসলমানদের নিজস্ব দুর্যোগ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর আল্লাহর বিধান পুর্ণরূপে মেনে চলতে হবে। আল্লাহর নির্দেশের কিছু মেনে আর কিছু না মেনে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতেই হবে এবং পরলোকেও জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

আল্লাহর বিধান অমান্যকরে মানব রচিত বিধানের অনুসরণ করলে মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য গড়ার কোন ভিত্তিই থাকবে না। ফলে অবস্থা একই রকম থেকে যাবে। এসব চিন্তা করে মুসলমানরা ইসলামের দুশমনদের গোলামী থেকে যদি মুক্ত হতে না পারে তাহলে এ অবস্থা থেকে অব্যাহতি লাভের সম্ভাবনা নেই। তারা জাতীয়তাবাদ ফিরকাবাজী ও সুফীইজমের গোলক ধাঁধায় পড়ে নিজেদের ঈমান আকিদা নষ্ট করে অমুসলিমদের পদতলে নিষ্পিষ্ট হতে থাকবে। কেউ তাদেরকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে না। আর কোন জাতি তার নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করলে আল্লাহও তা পরিবর্তন করে দেন না।

সুতরাং মুসলমানরা অমুসলিমদের গোলামী ও নির্যাতন থেকে মুক্ত হবে নাকি আল্লাহর পরিবর্তে তাদের কেই প্রভু মেনে মুসলিম জাতিকে আলাহর ঐসব দুশমনদের দাসানুদাস বানিয়ে রাখবে, তা তারাই সিদ্ধান্ত করবে। যদি মুসলমানদের বিশ্বের দরবারে মাতা তুলে দাঁড়াতেই হয়, তবে আর ব্যক্তি স্বার্থ নয়, সামগ্রিক স্বার্থের কথা ভাবতে হবে। আল্লাহ ছাড়া সকল তাগুতী শক্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের প্রকৃত কল্যাণ লাভে কাজ করে যেতে হবে। সকল সংকীর্ণতার উর্ধে থেকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করতে পারলে বিশ্বের কোন শক্তিই এ জাতিকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

অমুসলিমরা ও আল্লাহর বিধানে শান্তি পায়

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কোন সমাজে শান্তি বিরাজ করলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তার সকল বাসিন্দা শান্তির অংশ পায়, তেমনি অশান্তি চলতে থাকলে তার অংশও সকল বাসিন্দাকে কমবেশী গ্রহণ করতে হয়। ঘুষ ব্যতীত অফিস-

www.bjilibrary.com

আদালতে কাজ না হলে মুসলমানকেও যেমনি ঘুষ দিতে হয়, তেমনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টানকেও ঘুষ দিয়ে কাজ করাতে হয়। ঘুষ দিয়ে অযোগ্য মানুষ গাড়ী চালানোর লাইসেন্স নিয়ে দুর্ঘটনা ঘটালে শুধু মুসলমান যাত্রীরা নিহত হয় না; হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যে যাত্রীই ঐ গাড়ীতে থাকুক না কেনো মৃত্যুর ঝুঁকি সকলেরই থাকে। সরকারী কর্মকর্তারা ঘুষ নিয়ে লাইসেন্স পারমিট দেবার কারণে ব্যবসায়ীরা পণ্যের দাম বাড়ালে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষকেই চড়ামূল্য দিয়ে মালামাল খরিদ করতে হয়। হীন চরিত্রের মানুষ শাসন ক্ষমতায় থেকে আইনের শাসনের পরিবর্তে পেশীশক্তির দাপট দেখাতে থাকলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

টাকার বিনিময়ে বিচার খরিদ করা চলতে থাকলে কেবল ধনীরাই সুবিধা পায়, আর ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল গরীবই ন্যায় বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। সম্পদের সুষম বন্টন না হলে সকল ধর্মের লোকই বঞ্চিত হয়। এখন মানুষের এসব দুর্ভোগ ক্ষমতাসীন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর লোকেরা ছাড়া আর কারা দূর করতে পারবে?

সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দুর্নীতির আশ্রয় নিলে সাধারণ মানুষ কিভাবে তাদের সোজা পথে আনবে? এ কাজ তো কেবল সরকার পরিচালনাকারী ব্যক্তি গোষ্ঠীর দ্বারাই সম্ভব। এখন এই গোষ্ঠীর লোকরাই যদি সৎ না হয়, তবে অসৎ কর্মকর্তাদের স ৎপথে পরিচালনার দায়িত্ব তারা নেবে কেন? বরং তারাই তো সম্পদের সিংহভাগ অন্যায়পথে হস্তগত করতে দেশময় দুর্নীতির জাল বিস্তার করে দেবে।

আর যারা বস্তুবাদে বিশ্বাসী এবং রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষতার গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখশতে চায়, তারা কার ভয়ে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে সৎ নীতির প্রবর্তন ও সৎ জীবনযাপন করতে থাকবে? মানুষের ভয়ে? মানুষের চোখকে তো সহজেই ফাঁকি দেয়া যায়। দুনিয়ার কাজ কর্মের হিসাব পরলোকে দেয়া লাগবে তারা তো এটা বিশ্বাস করে না। সুতরাং লোক চক্ষুর আড়ালে অন্যায় কাজ করলেও আল্লাহ দেখবেন এবং শেষ বিচারের দিন এ কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে- এ ভয়ে তাদের সৎ থাকার প্রশ্নই উঠে না। প্রকৃত প্রস্তাবে খোদাভীরু পরকালে জবাবদিহির ভয়ে ভীত ব্যক্তিরাই সৎ জীবনযাপন ও সৎ নীতির প্রবর্তনে তৎপর থাকেন। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে এ ধরনের সৎ ব্যক্তিরাই এগিয়ে আসেন এবং তারা ক্ষমতাসীন হলে সমাজ থেকে সকল প্রকার দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি অপসারিত হয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যার ফলে, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল মানুষ ন্যায্য অধিকারসহ শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

সুতরাং একমাত্র ইসলামী রাজনীতিই পারে মুসলিম-অমুসলিম সকল নাগরিকের সুখ-শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে। ইসলামী রাজনীতির ভিত্তি আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে নিজ দেশের অন্যায় স্বার্থ হাসিলের জন্য অপর কোন দেশের সাথে অ-বিচারমূলক আচরণ করার অধিকার রাখে না। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিবেশী দেশের বাসিন্দারা এ রাষ্ট্রের দ্বারা কোন প্রকার নির্যাতন, নিপীড়ন ও শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয় না। একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, আল্লাহর বিধানের রাজনীতি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রভূত্বের রাজনীতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মানুষের পার্থিব কল্যাণ সাধনের নিশ্চিত নিরাপত্তা বিধান করে।

শেষ কথা

সুধী পাঠক, পৃথিবীর সকল মানুষের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানকারী আল্লাহর দ্বীনের রাজনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ নিজ স্বার্থেই সকল মানুষকে এগিয়ে আসার

www.bjilibrary.com

দরকার। পূর্ববর্তী আলোচনায় আশা করি একথা পরিষ্কার হয়েছে। বিশেষভাবে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর আইন যমীনে প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব স্বীকার করেই কালেমা তাইয়্যেবার প্রতি আন্তরিক ও মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আল্লাহার প্রদত্ত বিধানের কিছু মানা আর কিছু অমান্য করার অবকাশ আল্লাহ কাউকেই দেননি। তিনি বলেছেন, তোমরা আল্লাহর আয়াতের কিছু মানবে আর কিছু করবে অমান্য, এ অধিকার তোমাদের কে দিয়েছে? নিশ্চয়ই যে এরূপ করবে, সে পৃথিবীতে হবে লাঞ্ছিত এবং পরকালে তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব, আল কুরআনে বর্ণিত কোন আয়তকেই অমান্য করা যাবে না, হয় দেওয়ানী আইনের আয়াত হোক কিংবা ফৌজদারী বিষয়ের নির্দেশনা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর সকল কাফের-মোশকেরদের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও আল্লাহর বিধানকে সকল বিধানের উপর বিজয়ী করার জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তিনিই সেই মহান সত্ত্বা আল্লাহ যিনি সত্য দ্বীন ও হেদায়েত সহকারে রাসূল প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর এ দ্বীনকে বিজয়ী করে দেন, এতে মুশরেকরা যাই মনে করুক না কেন।" তিনি মুসলমানদেরকে বলেছেন, "তোমরা উত্তম জাতি, তোমরা সকল মানুষের জন্য সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।"

আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী করার কাজে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির পরোয়া করা যাবে না, কেননা মুমিন তো বিশ্বাস করে তার জানমাল সবকিছুই আল্লাহর। আল্লাহ বলেছেন, "বেহেশতের বিনিময়ে আল্লাহ মুমিনের জানমাল খরিদ করে নিয়েছেন।" এখন আল্লাহর পথে আল্লাহর জানমাল ব্যয় করতে হবে এটাই তো স্বাভাবিক। আল্লাহর পথে জানমাল ব্যয় করাই মুমিনের জন্য প্রকৃত সাফল্য।" কারণ মুমিন এটাও বিশ্বাস করে আখেরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ। সেখানকার জীবনের সমাপ্তি নেই। এ লক্ষ্য অর্জনে দুনিয়ার জীবনে লড়াই সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। এ ব্যাপারে লড়াই করলে অবশ্যই আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়া যায়। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা আল্লাহর পথে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে।"

মহানবী (সাঃ) আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী করার কাজে আল্লাহর পথে জিহাদ করা সম্পর্কে বলেছেন, "যাহারা জিহাদ করলো না জিহাদের বাসনা পোষণ করলো না, তারা ইহুদী হয়ে মরুক না হয় খৃষ্টান হয়ে মরুক তাতে আমার কিছু আসে যায় না।"

এখন আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী করতে, পৃথিবীর মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিতে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে আল্লাহর সকল হুকুম মেনে চলতে সর্বোপরি আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে, মুসলমানদেরকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে আল্লাহর পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ জন্য তাদেরকে অবশ্যই রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। এ ক্ষমতা হস্তগত না হয়ে থাকলে তা হস্তগত করার বৈধ সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এছাড়া আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী করার, পৃথিবীর মানুষকে তাগুতের খপ্পর থেকে মুক্ত করার, মানব কল্যাণ হাসিল করতে আল্লাহর বিধান পুরোপুরি কার্যকরী করার বিকল্প কোন পথ আল্লাহ মানুষের জন্য খোলা রাখেননি। মহান আল্লাহতায়ালা মানুষকে সত্য উপলব্ধি করার তৌফিক দিন। আমিন!!

www.bjilibrary.com